অভিজ্ঞতার মূল্য

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার

উৎসর্গ পত্র

যাঁহার

অবিচলিত ভগবৎ-প্রেম—

অপূর্ব্ব জ্ঞান সম্ভার—

সুললিত ভাষা-সমৃদ্ধ আশীর্ব্বাণী,

আমার জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে,

সেই স্নেহময়ী পরমারাধ্যা স্বর্গগতা

মাতৃদেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে

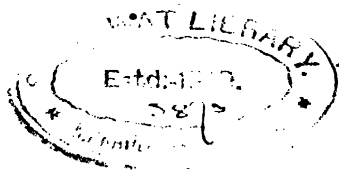
এই অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য

অর্পণ করিলাম।

সমস্তিপুর
১০ই ভাদ্র, ১৩৪৩

গ্রন্থকার

অভিজ্ঞতার মূল্য



অভিজ্ঞতার মূল্য

১

মনিয়ারপুরের জমিদার-তনয় বাবু কিশোরীলাল সিংহ, গ্রামের ভূমিহার-সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নের ন্যায়, আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, যখন সদর আদালতে বাহির হইতে লাগিল, তখন তাহার মত মেধাবী যুবক যে অচিরেই পশার জমাইয়া ফেলিবে, সে বিষয়ে গ্রামের সকলেই একবাক্যে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করিয়াছিল।

প্রিয়দর্শন এই যুবকের ধনী পিতা বংশ ও ব্যবসার মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে, কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটি সাধ্যমতে হইতে দেন নাই। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বিশিষ্ট সুরম্য পাকা বাসা-বাটী সহরের মধ্যস্থলেই ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, এবং কিশোরীলাল তাহা স্বীয় রুচিমত ফুলের বাগান করিয়া রমণীয় করিবার আয়াস পাইত।

বৃহদাকার আইন-পুস্তক পূর্ণ সুচিক্কণ আলমারী, পালিস-মসৃণ টেবিল. চেয়ার সোফা ও মূল্যবান পর্দ্দা শোভিত বৈঠকখানায়

উকীল সাহেবকে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন-রত দেখা যাইত। মক্কেলের যাতায়াতও অল্প-বিস্তর হইতে লাগিল, তবে তাহারা অধিকাংশ স্বজাতি বা স্বগ্রামবাসী, অথবা নবীন উকীলের আইন-জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা-বিচার-প্রয়াসী।

এই ভাবে বছরতিনেক অতীত হইয়া গেলেও পিতার নিকট হইতে মাসহারার কোনও তারতম্য হইল না দেখিয়া সমব্যবসায়ী ও বন্ধুগণ নানাবিধ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এক দলের এইরূপ অভিমত ছিল যে পাচক ভৃত্য মালী রাখিয়া সহর বাসের ব্যয় ঐ ভাবে থাকিতে গেলে মাসহারার অধিক নিশ্চয়ই পড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া ইদানিং মক্কেলদের যেরূপ দুরবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাহারাই বা ভাল ফি কোথা হইতে জোগান দিবে? আর কিশোরীলালও ফি-এর জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

অন্য দল বলিত, হাকিমদের অনুগ্রহে কমিশন ইত্যাদি ভাল রকমই পাইত বটে, কিন্তু কিশোরীলালের আদৌ প্র্যাক্‌টিস্ হয় নাই।

তাহার পিতাকে কেহ এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিতেন যে, অফ্‌সার হাকিম ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সাহচর্য্যে যদি তাঁহার পুত্র দশের একজন হইতে পারে তাহা হইলে তাহার উচ্চশিক্ষা লাভ ও ব্যয় সার্থক হইবে। অপর পক্ষে নিজেদের জমিদারীর মামলা মকর্দ্দমা লাগিয়াই আছে। তাহার তদ্বির করিতে পারা,

অভিজ্ঞতার মূল্য

দালাল মুহুরীর দ্বারা প্রতারিত না হওয়া, উকীলের খরচা হইতে অব্যাহতি পাওয়া, উপরন্তু আদালতের কুটনীতি ও আইনের জটিলতা কতক আয়ত্ত করিতে পারা—ইহাও কি কম লাভের কথা?

সুতরাং পশার না হইলেও কিশোরীর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইল না।

২

বিহারের এই অঞ্চলে পূবে বাতাস অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহাও একটি কারণ, যাহা এই দেশবাসীকে সভ্যতার উচ্চ-সোপানে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে।

সভ্য মহলে মাথার শিখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া এমনই অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল এবং কেশের মধ্যে এরূপে শায়িত থাকিত যে টোপি পরিধান না করিলেও সহজে যেন তাহা দৃষ্টিগোচর না হইতে পারে। এবং শিক্ষিত সমাজে উক্ত ভূষণও অবসর প্রাপ্ত হইতেছিল।

উন্মুক্ত-বক্ষ কোট, সার্ট বা ঢিলা পাঞ্জাবী ও সযত্ন কুঞ্চিত, আপাদলুণ্ঠিত ধোতি পরিহিত যুবকের দল, হাত ঘড়ি পরিয়া, ছড়ি ঘুরাইয়া, স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিহারী ক্লাবে উপনীত হইয়া বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের নভেলের হিন্দি অনুবাদে মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিল।

ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে বোধ করি কৌতুকপ্রিয় পবনদেব এই প্রদেশের নারী জাতির পর্দ্দা উড়াইবার একটা প্রবল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

'নন্-কো-অপারেশন' তখন পূরাদমে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই আনুসঙ্গিক ও কতকটা অন্তর্ভূত হইয়া বিহারে পর্দ্দা-

আন্দোলন সবেমাত্র বিস্তার লাভ করিতেছে। শেষোক্ত আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে খাঁটি নন-কো-অপারেটর না হইলেও কিশোরীলাল কিছু কম উৎসাহী ছিল না; এবং এই সহরে মোক্তার রামজনম লালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তদপেক্ষা তাঁহার স্ত্রী মিসেস লীলাবতী লাল না-কি অধিকতর উদ্যোগী ছিলেন।

এ স্থলে এই দম্পতির সম্বন্ধে কয়েকটি কথা হয়ত প্রয়োজন। সাংসারিক বিশেষ কারণ বশতঃ মোক্তার সাহেব বিবাহ করেন, একটু পরিণত বয়সে। সেই বৎসর তাঁহার স্ত্রী চৌদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কলিকাতা হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হন। রামজনম বার কয়েক মোক্তারশিপ ফেল করার পর তাহার বছর দুই পূর্ব্বে কৃতকার্য্য হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

লীলাবতীর পিতা কলিকাতার এক সওদাগর অফিসে মোটা মাহিনার চাকুরী করিতেন। শৈশবে মাতৃহীনা এই কন্যার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি সমধিক যত্নবান হইয়া তাহাকে স্কুলে রীতিমত পড়াইয়াছিলেন, উপরন্তু বাটীতে শিক্ষক রাখিয়া সঙ্গীত বিদ্যাতেও পারদর্শী করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে কলিকাতাতেই একটি সুপাত্রের হস্তে এই আদরিণী কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু হঠাৎ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া চাকরিতে অবসর লইয়া, তাঁহাকে কার্সিয়ংএ কয়েক বৎসর থাকিতে হয়। নানা প্রকারে বিপন্ন হইয়া তিনি পূর্ব্ব সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাহার পর প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অভিজ্ঞতার মূল্য

বিবাহের পর পল্লীগ্রামের রীতিনীতি চাল-চলন এই নব-পরিণীতা শিক্ষিতা বধূকে প্রথমটা স্তম্ভিত ও বিমর্ষ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে লীলাবতী অল্পদিন মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও উদার স্বভাবের পরিচয়ে রামজনমকে বিস্মিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রায়ই মনোমালিন্যের সূচনা দেখা যাইত। বুদ্ধিমতী এই যুবতী ক্রমেই সেই ভাব দূরীভূত করিয়া, প্রীতি ও পরার্থপরতার দ্বারা সামঞ্জস্য ও শান্তির সৃজন করিতেছিলেন, এমন সময় পর্দ্দা-আন্দোলন তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনে একটা প্রবল আঘাত দিয়া গেল।

৩

পাটনা, গয়া, ছাপরা, আরা, মজঃফরপুর ইত্যাদি স্থান হইতে আগত, নেতৃবৃন্দ পরিশোভিত বিরাট সভার অবসানে সেদিন রামজনম ও কিশোরীলাল সন্ধ্যার পর ডাক্তার ভবানীচরণ লাহিড়ীর বাটীর দরজায় আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন—দাদামোশাই—দাদামোশাই!

ডাক্তার বাবুর তখন আহ্নিক শেষ হয় নাই, সেজন্য বাহিরে আসিতে একটু বিলম্ব হইল।

দরজা খুলিয়া, সাদর আহ্বান করিয়া বলিলেন—এস ভাই—এস!!

কিশোরী থাকিত ডাক্তার বাবুর পাশের বাড়ীতেই এবং এই সভায় আমন্ত্রণ করিয়া আজও সকালে তাঁহাকে তাগাদা দিয়া গিয়াছে। সুতরাং কিছু উষ্মার সহিতই সে বলিয়া উঠিল—আখরস্ আপ নেহি না গেয়েঁ!

তাহাদের বসাইয়া ডাক্তার বাবু বিনীত স্বরে বলিলেন—কি করব ভাই। ঠিক চারটের সময় বেরোবো ব'লে তৈরি হয়েছি, একটা কলেরা কেসে ডাকতে এল।

রামজনম ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন—মিটিং ত ছিল পাঁচ বাজে, কেস দেখেও ত আপনি যেতে পারতেন!

সিগারেটের ডিবা আগাইয়া দিয়া ডাক্তার লাহিড়ী বলিলেন—আমার বয়স হ'ল তিপ্পান্ন, আর তোমার দিদিমার বেয়াল্লিশ, এ বয়সে পর্দ্দা আমাদের থাকলেও ক্ষতি নেই, উঠলেও বিশেষ লাভের সম্ভাবনা দেখি না! কিন্তু আসল কথা তা নয়। আট মাইল পথ গিয়ে রোগীকে স্যালাইন দিয়ে ফিরতে আমার প্রায় সাতটা বেজে গেল।

কিশোরী তখন বলিতে লাগিল—আজ যদি আপনি লালা রঘুনন্দনলালের অভিভাষণ শুন্‌তেন ত বুঝতে পারতেন যে আপনার খেয়াল কত গলৎ! কোনও বিষয়ের প্রতীক্ষা করে বসে থাকলে সে হয়ত কোনও দিনই না আস্‌তে পারে। সময়ের ভরসায় না থেকে, কায দিয়ে তাকে আগিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে, তা না হলে জগতের অন্যান্য অসভ্য জাতির মত সব দিক থেকেই আমাদের পেছিয়ে পড়ে থাক্‌তে হবে। আর কোনও জাতির উন্নতি নির্ভর করে অন্ততঃ কতক পরিমাণেও তার নারী-সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার ওপর। সুতরাং তাদের যদি অন্দরে বন্ধ করে, বাদ দিয়ে চলা যায়, তাহলে কোনও কাযই সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের কায যে কতদূর এগিয়েছে আজ তার বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। আজকার সভায় ভদ্র জেনানা কত হাজির ছিলেন, জানেন? প্রায় আড়াই শ!

ডাক্তার সিগারেট ধরাইতেছিলেন, তাহাতে একটা টান দিয়া ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নেই! তার পর

একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—লালাজি হয়ত ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে চাইনে। তবে আমার এই পাকাচুলের অভিজ্ঞতা, অনেক দেখে শুনে জান্‌তে পেরেছে যে সহসা বোরখা খুলে গাউন্ পরতে গেলে হয়ত বিপদ হতে পারে।

মোক্তার সাহেব চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, বিপদ? কি রকম বিপদ আগে শুনি?

—মৃদুভাবে মাথা নাড়িয়া ডাক্তার উত্তর করিলেন—সে কি আমি বল্‌তে পারি? আমার সে দূরদৃষ্টি কই? কৃতকর্ম্মা পুরুষ আপনারা, অন্দর বাহির সকল দিক বিবেচনা করে দেখ্‌বেন! কিন্তু এতদিনের সংস্কারের বিরুদ্ধে, মনের সঙ্কীর্ণতা দূর না করে, হঠাৎ একটা বিপরীত কিছু করতে গেলে যেন বিপর্য্যয়, হট্টগোলের সৃষ্টি হবে বলে আমার আশঙ্কা হয়।

কিশোরী বলিয়া উঠিল—আপনার এই আশঙ্কার ভিত্তি কোথায়, প্রমাণই বা কি?

ডাক্তার কি যেন বলিতে গিয়া মুখ নামাইয়া, হাসি চাপিবার মত করিলেন।

মোক্তার সাহেব সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—ভিত্তি? ভয়ের ভিত্তি ওঁর নিজেরই দুর্ব্বলতা!

মুখ তুলিয়া উদ্গত হাসিটিকে যেন ছড়াইয়া দিয়া ডাক্তার বলিলেন, হতে পারে স্নায়বিক! আর এ বয়সে তা হওয়াই স্বাভাবিক। সেই জন্যেই ত তোমাদের বাধা দিতে চাইনে,—

তোমরা কায করে যাও, অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করো,. তা'র দামই কি কম ?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কিশোরী বলিয়া উঠিল—তাহলে এতদিনে বুঝতে পারা গেল, আপনি আমাদের দলে নয়, পর্দ্দার স্বপক্ষে !

স্মিতহাস্যে ডাক্তার উত্তর দিলেন—আগেই ত বলেছি, কোন পক্ষ নেবার বয়স আমার চলে গেছে। যে পথ ধরেছি, সেটা হয়ত তোমাদের মনোমত না হতে পারে ; কিন্তু ফেরবার সময় ও শক্তি যে আমার আর নেই, ভাই !

কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইল,—আমাদের কিন্তু এবার বাসায় ফিরতে হবে, রাত হ'ল। আজ চল্লাম, কিন্তু দাদামোশাই, আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি আর একবার ভেবে দেখবেন, স্ত্রীলোক সহায় হলে এই জীবন-সংগ্রামে পুরুষের কত বড় সাহায্য হতে পারে।

ডাক্তারও উঠিয়া পড়িয়া সহাস্যে বলিলেন—সে ত নিশ্চয়, তা কি অস্বীকার করবার যো আছে ? তিনি যে অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং better half ! তবে সাহায্যটা কি প্রকারের সেইটেই হচ্ছে বিবেচ্য !

৪

বিলাসপুর ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে, মনসারি গ্রামে, মহিলাদের যে আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার স্থানীয় জমিদারপুত্র অযোধ্যালালের উপরই প্রধানতঃ ন্যস্ত ছিল।

মহিলাশ্রমের উপস্থিত প্রধান কার্য্য ছিল—চরকা ও খদ্দর প্রচার; অবশ্য পরে একটা নারী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনাও ছিল।

এই গ্রামে অযোধ্যালালের পিতা গোবিন্দ ভকতের এক আনা জমিদারীর অংশ ছিল। পাটনা কলেজে বি-এ অধ্যয়নের সময় নন্-কো-অপারেশন হাঙ্গামায় মিশিয়া অযোধ্যা মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পর দেশের কাযে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, কারাবাসী হইয়া, অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্য দেহ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সে প্রায় মাস ছয়েকের কথা হইবে।

কৌশলে পিতার নিকট হইতে কাঠা দশেক জমি লইয়া অযোধ্যা একটি ছোট-খাট বাংলা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, ক্রমে তাহাই মহিলাশ্রমে পরিণত হয়।

চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারের বিরোধী নাগরা, বা শ্লিপার পরিহিতা, নিরবগুণ্ঠনা সভ্য মহিলাদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি, নিরক্ষর স্থূলবুদ্ধি গোপ সমাজের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন ও বিদ্রোহের সূচনা করিবে তাহা বিচিত্র নহে।

গ্রামবাসী সকলেই যদি একযোগে এই ভদ্র নবীনাদের কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধমত হইতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু বিপদ হইয়াছিল এই যে, যে পরিমাণে বৃদ্ধ প্রবীণেরা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ইহার আশু প্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন, ঠিক সেই অনুপাতে যুবকের দল উৎসাহিত হইয়া পরোক্ষে ইহাদের সাহায্য করিতেছিল। ফলে দাঁড়াইয়াছিল এই যে, প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে একটা সম্মুখ-যুদ্ধ অদূরবর্ত্তী বোধ হইতেছিল।

প্রকৃত পক্ষে চিন্তার বিষয় হইয়াছিল অন্ধকার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ অন্তর্ভূত অসূর্য্যম্পশ্যা যুবতীদের লইয়া! আজন্ম রুদ্ধ গৃহে আলো ও বাতাস প্রবেশ করিলে যেরূপ সজীবতা ও নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়, তেমনই অবরোধ-প্রথা-ক্লিষ্ট এই পর্দ্দানসীনদের মনে-প্রাণে মুক্তির অব্যক্ত আনন্দ-প্রবাহের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমেই তাহারা আশ্রমবাসিনীগণের আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং তাহাদের সংস্পর্শে এমনই আশু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে আলাপ আপ্যায়নের ছলে কেহ কেহ লোকলজ্জা পরিহার করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবেই আশ্রমে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কতকগুলি যুবকও অযোধ্যালালের অধীনে খদ্দর প্রচার কার্য্য লইয়া নানাবিধ ভাবে ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল!

ঠিক এই সময়ে একদিন নিশীথ রাত্রে অকস্মাৎ অগ্নি-সংস্পর্শে ভীষণ কোলাহলের মধ্যে, আশ্রম গৃহখানি ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

৫

রবিবারের সকাল। বাহিরের দালানে রামজনম আরাম কেদারায়, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে একটা খবরের কাগজ হাতে, শুইয়া ছিলেন। এমন সময়ে আশ্রমের ভৃত্য ফাগুনি আসিয়া সংবাদ দিল যে, গত রাত্রে কোন দুর্ব্বৃত্ত আশ্রম-গৃহ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে।

ঘরের ভিতর লীলাবতী কেশ প্রসাধনে রত ছিলেন, কথাটা কানে যাইতেই তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁ রে ফাগুনি, সব ঘর পুড়ে গেছে ?

হতাশাব্যঞ্জক ভাবে মাথা নাড়িয়া ভৃত্য জানাইল যে সবই পুড়িয়াছে। বিস্ফারিত নেত্রে লীলাবতী বলিলেন—মাইজিরা ? ফাগুনি বলিল—সব ভাল আছেন। লীলাবতী তখন স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এই ট্রেনেই যেতে হবে, তুমি তৈরী হয়ে নাও, রান্না হয়ে গেছে। ফাগুনিকে বলিলেন—হাঁরে, তারা আছে কোথায় ? কত রাতে আগুন লাগ'ল ?

বছর পনের বয়স হইলেও ফাগুনি ইতিমধ্যে একবার কলিকাতা সহরটা দেখিয়া আসিয়াছিল। একটু চিন্তা করিয়া সে উত্তর দিল—তা, রাত ঠিক দু বাজে। তাহার পর নিজ মনেই যেন বলিতে লাগিল—কাল আবার অযোধ্যাবাবু সহরে চলে গিয়েছিলেন। আমি ছাড়া আর কোনও পুরুষ আশ্রমে ছিল না।

ওসারায় শুয়েছিলাম, আগ্ লাগতেই বেলা মাইএর নিদ্ টুটে যায়। তিনি কুহর করে উঠতেই আমরা সকলে জাগ হয়ে যাই। উঠেই দেখি না—

একটা ধমক দিয়া লীলাবতী বলিলেন—তারা এখন আছে কোথায়, সেইটে আগে বল্‌তে বল্‌লাম না?

থতমত খাইয়া ফাগুনি উত্তর দিল—বাবু গোবিন্ ভক্তের যে মনহুস দালান, পিপর গাছের পছিয়ারিতে আছে না? তাতেই গিয়ে আমরা ডেরা দিয়েছি।

একটু শিহরিয়া লীলাবতী শুধু অস্ফুটস্বরে বলিলেন—উঃ সেই দালান। রামজনমের প্রতি তাকাইয়া তারপর কহিলেন—তুমি অমন উদাস হয়ে পড়লে কেন? ওঠো, আর দেরী কোরো না। যারে ফাগুনি, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়—জল্‌দি।

ফাগুনি চক্ষের পলকে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু মোক্তার সাহেবের উঠিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না! অবশেষে বলিলেন—আমি ত ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছি না। আশ্রম যে কি করে চল্‌বে জানি না।

কবরীটা জড়াইয়া ফেলিয়া লীলাবতী বলিলেন—এত বড় কাযে, সামান্য এই বিপত্তিতে নিরাশ হলে ত' চলবে না—আরও কত রকম বাধা হয়ত আমরা পেতে পারি, তার জন্যেও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। উপস্থিত তাদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা সত্বর করতে হবে। তুমি এখন ওঠ তো বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টান দিলেন।

অভিজ্ঞতার মূল্য

রামজনম চেয়ার ছাড়িয়া বলিলেন—উঠ্তে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার পর—? হাসিয়া লীলাবতী কহিলেন—এই জন্যেই ত আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া নিতান্ত দরকার হয়েছে। নারীর বিপদে পুরুষ কতটা নিশ্চেষ্ট থাক্তে পারে, পুরাকাল থেকে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু থাক্ এখন ও-সব কথা। চলো, চট্ করে তোমায় খাইয়ে দিয়ে কিশোরীবাবুর বাসা হয়ে তবে ষ্টেশনে যাব।—বলিয়া তাঁহাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়াই চলিলেন।

৬

কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আসিয়া সেদিন কিশোরীলালের বৈঠকখানায় আসর জমাইয়া তুলিয়াছিল।

চা'য়ের পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া রামপদারক কহিলেন—এই রকম ঝগড়া স্বামী-স্ত্রীতে মাঝে মাঝে হয়, কিশোরী বাড়ী না গেলে, অন্ততঃ রবিবারটা আমাদের নাফা বই লোকসান নেই। কচুরীর সঙ্গে চা লাগ্‌ছে তোফা!

জিজ্ঞাসুমুখে ব্রিজ্‌বিহারী কহিলেন—আচ্ছা ভাই, ঝগড়ার কি কারণ তা' ত জান্‌তে পারলাম না, চিঠিই এসেছে শুন্‌ছি?

কিশোরী নীরবে হাসিতেছিল।

তাড়াতাড়ি একটা কচুরী গলাধঃকরণ করিয়া মুরলীমনোহর বলিয়া উঠিলেন—তা আর আন্দাজ করতে পার নি? এই মহিলা-সমিতি, তার ওপর গত শনিবার বাড়ী না যাওয়া।

রামপদারক বলিলেন—তা' ত সন্দেহ হতেই পারে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের—

বাধা দিয়া মুরলীমনোহর বলিয়া উঠিলেন—এখন রাখ ওসব গবেষণা। দেখি ভাই, কিশোরী, তোমার স্ত্রীর চিঠি! জানহে বিরিজ, সেই পত্রের মধ্যে কত দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল, বিরহ ব্যথা নিহিত আছে। ওসব চাপা দিয়ে হয়ত প্রকাশ পেয়েছে

কেবল অভিমান আর রাগ! দেখি না ভাই সেই মিঠেকড়া-চিঠিটা একবার!

বন্ধুবর্গের অনেক অনুনয় অনুরোধের পর কিশোরী উঠিয়া বলিল—আচ্ছা আন্‌ছি, কিন্তু যেন—

এমন সময় ত্বরিত পদে মিসেস লাল প্রবেশ করিয়া বলিলেন—কিশোরীবাবু! বড় জরুরী কায, ষ্টেশনে যেতে হবে—এক মিনিট দেরী নয়।

চেয়ার ছাড়িয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিশোরী কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল। মিসেস্ লাল বলিয়া উঠিলেন—কোন কথা নয়—ট্রেন মিস্ হবে তা'হলে আমার! পথে যেতে যেতে সব কথা হবে।

কিশোরী বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। মুরলীমনোহর একটা চেয়ার টানিয়া, মিসেস লালকে বলিলেন—বসুন।

মিসেস্ লাল ব্যস্তভাবে বলিলেন—না বস্‌বার সময় নেই। আপনারা আমায় মাফ কর্বেন। মিনিট দশেকের জন্য কিশোরী-বাবুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কিশোরী প্রস্তুত হইয়া আসিতেই লীলাবতী অগ্রসর হইলেন। বন্ধুদের নিম্নস্বরে কি বলিয়া কিশোরী আসিয়া ট্যাক্সিতে বসিল।

পথিমধ্যে লীলাবতী ব্যাপারটা সংক্ষেপে কিশোরী বুঝাইয়া দিলেন। রামজনম কোন কথা কহিলেন না।

ট্রেনে বসিয়া মিসেস্ লাল বলিলেন—ভগবানের কৃপা যে আজ

আপনি বাড়ী যান্ -নি। ফিরে গিয়ে এখুনি ডাক্তার লাহিড়ীকে ধরবেন। বাইরে তাঁর তিনটি ঘর এক রকম পড়েই আছে। সব ঠিক থাকে যেন! আমরা সকলকে নিয়ে সন্ধ্যার গাড়ীতেই ফিরছি।

রামজনম শুষ্ক মুখে কহিলেন—ডাক্তার যদি রাজি না হ'ন?

লীলাবতী একটু রাগত ভাবেই উত্তর দিলেন—তোমার সব তাতেই নির্ভরসা আর নিরাশা।

বাঁশী দিয়া ট্রেন দুলিয়া উঠিয়া ছাড়িয়া দিল।

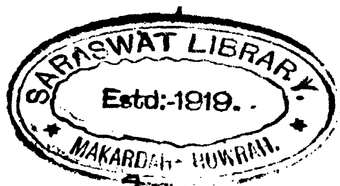
জানালার উপর হাত রাখিয়া কিশোরী প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ছিল।

ব্যস্ততার আতিশয্যে তাহার হাতখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া মিনতিস্বরে লীলাবতী বলিলেন—তা'হলে উপায়? তাদের স্থান—

কিশোরী বলিয়া ফেলিল—ভাবনা কি? আমার বাসা রয়েছে!

স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া লীলাবতী বলিলেন—আঃ, বাঁচালেন—আপনি না হ'লে—

ট্রেন তখন দ্রুতগতি হইয়াছে,—আর কথা শোনা গেল না।



আনন্দোজ্জ্বল নেত্রে লীলাবতী তাঁহার স্বামীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন—আমি জানি, কিশোরীবাবুর সব কাযে আন্তরিকতার অভাব কোথাও লেশমাত্র পাওয়া যায় না।

রামজনম একটু রুক্ষ ভাবেই বলিয়া উঠিলেন—তাঁর বাসায় মহিলাদের রাখা কোন মতেই উচিত নয়।

গভীর বিস্ময়ের সহিত লীলাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ?

রামজনম দৃঢ়ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

উত্তরের অপেক্ষায় লীলাবতী বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার অপূর্ব্ব হাসিটি সূর্য্যের শেষ রশ্মির মত সুন্দর মুখের সমস্ত লালিমা নিঃশেষ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া জানালার উপর মাথাটি হেলাইয়া দিয়া লীলা বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের দৃশ্যের মধ্যে মগ্ন হইয়া গেলেন।

উন্মত্ত বিক্রমে বাষ্পশকট তখন বাধাবিপত্তিহীন নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিয়াছিল। কামরার মধ্যে মুক্ত বায়ু অবাধ উল্লাসে নৃত্য করিয়া এই দম্পতির রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারে যেন পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল!

তথাপি কোন পক্ষ হইতেই সাড়া-শব্দের সূচনা দেখা গেল না; এবং কালক্ষেপের সহিত তাহার সম্ভাবনাও ক্রমে হ্রাস হইয়া

গিয়া ব্যথিত অন্তরদ্বয় অভাবনীয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

সেই কামরায় আরও দুইটি যাত্রী ছিলেন। একটি, বোধ হয় পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত কর্ম্মচারী, নিবিষ্ট চিত্তে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' চশমার ভিতর দিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। অপরটি, চঞ্চলমতি যুবক—দশ আনা ছয় আনা কেশ, এবং প্রায় মসিবর্ণ ত্বকের উপর সম্পূর্ণ খাস বিলাতি বেশ! নানা অছিলায় নানা ভাবে বসিয়া সুবিধামত নিমেষের জন্য লীলাবতীর প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। প্রকৃত ব্যাপার তাহার সম্যক বোধগম্য না হইলেও, কোনও কারণে একটা মনোমালিন্যের পালা চলিতেছে তাহার আভাস পাইয়া এই দেশী সাহেব সুগন্ধি রুমালের সাহায্যে পোষাক ঝাড়িয়া মুছিয়া, মধ্যে মধ্যে প্রফুল্ল ভাবে শিষ দিয়া উঠিতেছিল।

মোক্তার সাহেবের মন ও চক্ষু অস্থিরতায় চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল; তথাপি যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া তিনি শান্ত ভাবে বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্মুখস্থ সাহেবের কায়দা কসরৎ তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

এই ভাবে দুইটা ষ্টেশন ছাড়াইয়া তিন কোয়ার্টার পরে ট্রেনের গতি সহসা মন্থর বোধ হওয়াতেই, পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যাইবার উদ্দেশ্যে রামজনম ও কালাসাহেব যুগপৎ ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইতে তাঁহাদের একটা সংঘর্ষণ হইয়া গেল।

তাহার বেগ সামলাইতে না পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে

মুষ্টিবদ্ধ হস্তে রামজনম বেঞ্চে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সাহেব বাঁ হাতে দেওয়াল ধরিয়া টাল সামলাইতে সামলাইতে ডান হাতের রুমালটি নাসিকার আহত স্থানে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ওঃ।—মাফ্ কিজিয়ে গা।

লীলাবতী ঘাড় ফিরাইয়া ঘটনার আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন! গাড়ি তখন ষ্টেশনে থামিয়া গিয়াছে।

ফাগুনি এক লাফে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—কোন্ সওয়ারি মাইজি, মেযানা কি রয়েল গাড়ি ?

৮

প্রাচীন বিরাট পিপর গাছটির শাখা প্রশাখা হইতে অসংখ্য বাদুড় সমস্ত দিন নিম্নমুখী হইয়া ঝুলিয়া তাহাদের বিচিত্র কলরবে সে স্থান মুখরিত করিয়া রাখিত। তাহার পশ্চাতে এক বহু পুরাতন মাটির দালান, ঘন বাঁশঝাড়ি ও শিশবন্নির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এখনও কোন ক্রমে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দেওয়ালের মাটি কালের গতির সহিত স্থানে স্থানে খসিয়া পড়িয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ ক্ষুদ্র বৃহৎ ইন্দুরের গর্ত্তে প্রায় ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে। মাথার চালের খাপরা অধিকাংশ খসিয়া পড়িয়া ঘরের ভিতর বেশ রৌদ্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। দরজা জানালা অনেক দিন পূর্ব্বেই কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

নিবিড় বাঁশঝাড় ও শেওড়ার জঙ্গলের মধ্যে শৃগাল অকুতোভয়ে বাসা করিয়াছে। ঘুঘু, শালিক, ছাতারে, ডাহুকের কলকণ্ঠের মিলিত ঐক্যতানে তাহাদের নির্ব্বিবাদ বিহারের পরিচয় দিতেছে।

বিপন্না আশ্রমবাসিনীগণ কী গভীর দুঃখে এই ভগ্নাবশিষ্ট গৃহের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত!

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। গৃহের এক পার্শ্বে অর্দ্ধদগ্ধ আসবাবপত্র, বস্ত্রাদি, স্তূপীকৃত, অপর পার্শ্বে চাটাই পাতিয়া বসিয়া তাঁহাদের মধ্যাহ্নভোজনের উপক্রম হইতেছিল—চুড়াদহি!

দাসী রামবতিয়া বয়সে প্রবীণা, গৃহকর্ম্মেও নিপুণা! কলাপাতার উপর চুড়া ঢালিতে ঢালিতে সে বলিতেছিল—ভাবনায় আর কি ফয়দা হবে? ফাগুনি যখন সহরে গেছে তখন একটা ইন্তেজাম্ না করে কি আর সে আপস্ আসবে? আগা সব ভোজন করে নাও।

সুমিত্রা কুঁয়র বিনাইয়া বলিতেছিলেন—ভোজন করতে কি আর জি লাগ্ছে দাই! এখানে কি আদমি বাস করতে পারে? দিল আমাদের বিলকুল ঘবড়ে গিয়েছে।

বেলা সর্ব্বকনিষ্ঠ, বয়স মাত্র সতের। হাঁটু দুইটার মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সে বসিয়া ঢুলিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল—সুমিত্রাদি, আজ যদি ফাগুনি আর না আসে?

ভীত কণ্ঠে সুমিত্রা বলিলেন—বরাতে যা থাকে, সাঁঝের আগেই আমি কারও দোরে গিয়ে পড়ে থাকবো—তবু এখানে আর নয়।

খাড়া হইয়া রামবতিয়া বলিল—কোনও ডর্ নেই মাইজি!

এমন সময় একদল বাদুড় ডানাঝাড়ার সহিত মিলিত এক বিকট শব্দ করিয়া উঠিল! সুমিত্রা তখন 'দাইগে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই, সকলে ভয়ার্ত্ত স্বরে সমবেত উচ্চ কলরব করিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অবশেষে লীলাবতীর অভয়বাণীতে তাহাদের যেন চেতনার উদয় হইল—ভয় কি, ও যে বাদুড়! চিড়িয়া!

বেলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া অস্ফুট স্বরে শুধু বলিল—লীলাদি! তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বেলাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া লীলাবতী বলিলেন—ভয় কি দিদি, আমি ত এসেছি!

অদূরে অযোধ্যাপ্রসাদের গলা শোনা গেল—কোই হরজ নেহি হ্যায়, হাম্ সব্ ঠিক্ কর্ দেতেঁ হে।

সকলকে আশ্বাসবাক্যে প্রকৃতিস্থ করিয়া, বেলার মাথায় হাত বুলাইয়া লীলাবতী বলিলেন—তোমরা সব স্থির হয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেল, ততক্ষণে আমি অযোধ্যাবাবুর সঙ্গে একটু কথা কয়ে নিই।

সুমিত্রা বলিয়া উঠিলেন—এই শনাটা দালানে আমরা ডরেই খতম্ হয়ে যাব।

লীলাবতী হাসিয়া বলিলেন—সে কি আর আমায় বলে দিতে হবে সুমিত্রা! তোমরা খেয়ে নাও; আমি এখনি আস্‌ছি।

বাহিরে আসিতেই অযোধ্যা দুই হাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—আমার কসুর নেবেন না মিসেস্ লাল। আমি এইমাত্র এসে সব শুন্‌ছি।

দুইটা লোক একটা দড়ির খাটিয়া আনিয়া পিপর গাছের তলায় রাখিল। অযোধ্যা তাহা দেখাইয়া বলিল—আপনি বসুন—কিছু জলপান হোক।

উপরের দিকে একবার তাকাইয়া লীলা বলিলেন—ক্ষেপেছেন আপনি? এখন জলপান্, আর এইখানে? তার চেয়ে দু' তিনটে গাড়ি আনিয়ে দিন, এই বিকেলের ট্রেনেই আমরা ফিরে যেতে চাই।

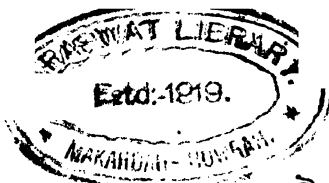
মাথা চুলকাইয়া অযোধ্যা বলিল—সেই কি ঠিক হবে? আশ্রম উঠিয়ে নিয়ে যাবেন একেবারে? অথচ এদিকে মুস্কিল হয়েছে—

হাসিয়া লীলাবতী বলিলেন—সব দিক্ ভেবেই যে আমি বলেছি অযোধ্যাবাবু!

রামজনম এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন,—ফিরবে ত! কিন্তু যাবে কোথায় তা কি ভেবে দেখেছ?

এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া লীলাবতী বলিলেন—তুমি যেখানে বল্‌বে। সে ভাবনা ত তোমার!

তার পর অযোধ্যার দিকে ফিরিয়া লীলা বলিতে লাগিলেন—আপনি যেন দুঃখ পাবেন না অযোধ্যাবাবু। আপনার অদম্য উৎসাহেই যে এখানে মহিলাশ্রমের উদ্বোধন সম্ভব হয়েছিল, সে কথা কোনও দিন ভুলে যাবার নয়! আপনার হাতে গড়া এই আশ্রমটি যাতে ভেঙ্গে না যায়, উপস্থিতক্ষেত্রে তার জন্য কি করা দরকার—কালই সহরে আস্‌বেন, একটা মিটিং করে তার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।



বাবু জয়করণ ঠাকুর ছিলেন কিশোরীর সহপাঠী ও বন্ধু। আইনের শেষ পরীক্ষায় জয়করণ পিছাইয়া পড়েন এবং সেই কারণে কিশোরীর ছয় মাস পরে বারে যোগ দেন। পতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, অত্যন্ত তৎপর ভাব। চক্ষু ঈষৎ কোটরস্থ হইলেও, উজ্জ্বল ও প্রখর। হাকিম ও মক্কেল আয়ত্ত করিতে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া একটা খ্যাতি ছিল। কিশোরীর অপেক্ষা রোজগার করিত অনেক বেশী, কিন্তু সে জন্য বন্ধুত্বের কোনও লাঘব হয় নাই।

ডাক্তার লাহিড়ীর কয়েকটি আত্মীয় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য শীঘ্রই আসিবেন, তাই অত্যন্ত দুঃখের সহিত তিনি মহিলাদের আশ্রয় দানে অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন।

কিশোরী তখন কিরূপে কি ব্যবস্থা করিবে এই সমস্যায় পড়িয়া বন্ধু জয়করণের বাসায় বিকালের দিকে উপস্থিত হইল।

বাসার সম্মুখেই একটি নবনির্ম্মিত দোচালার মধ্যে মক্কেল পরিবেষ্টিত জয়করণ হাত মুখ নাড়িয়া তাহাদের কানুনি বিষয় অবলম্বনে কূট পরামর্শ দিতেছিল। কিশোরীকে দেখিতে পাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে এক মিনিটের সময় চাহিয়া, উঠিয়া পড়িল।

কিশোরী বলিল—একটা জরুরী কাম আছে, ভাই—



অভিজ্ঞতার মূল্য

মক্কেলদের বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জয়করণ কিশোরীকে লইয়া ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল।

আশ্রমবাসিনীদের আগমন সম্ভাবনার সংবাদ দিয়া কিশোরী বলিল—তাঁরা যদি আমার বাসায় থাকেন ত, আমি যাই কোথায়, সেই ভাবনায় পড়ে গেছি।

জয়করণ হাসিয়া বলিল—মিসেস লালকে কথা দেবার সময় তুমি যে নিজেকে ভুলে বসে থাক্‌বে, সে আর আশ্চর্য্য কি?

কিশোরী বলিল—হাসি তামাসার কথা নয়, এই সন্ধ্যার ট্রেনেই তাঁরা আসছেন। ডাক্তার সাহেবের বাসায় যখন হল না, তখন আমার বাসাতেই তাঁরা উঠ্‌বেন, বিশেষ করে আমি যখন কথা দিয়েছি।

কিশোরীর পিঠ চাপড়াইয়া জয়করণ বলিল—কিসমৎ জোর, বন্ধু, তোমার কিসমৎ জবের্‌! তুমি তোমার বৈঠকখানাতেই থেকো, আমরা গেলে মাঝে মাঝে যেন—

কিশোরী রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—তোমার সব তাতেই তফ্‌রি ও দিললাগি। কাদের সামনে কথা বল্‌ছ জান?

তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া বসাইয়া জয়করণ বলিল—তা কি করে জানব ভাই—আচ্ছা আমি না হয় একদম গরহাজির থাক্‌বো—

কিশোরী বলিল—ছাড়, আমার অনেক কায আছে। এখনও সব বন্দোবস্ত হয় নি।

জয়করণ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—কি কি বন্দোবস্ত হবে শুনি ?

কিশোরী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

জয়করণ তখন বলিতে লাগিল—দেখ, এক কায করলে হয় না ? এই ঘরে আমি থাকি—পাশের ঘরটা ত খালিই পড়ে থাকে —তুমি স্বচ্ছন্দে এসে থাক্‌তে পার।

কিশোরী বলিল—তাহলে আমার পাক শাকের ব্যবস্থাও ওখানে করতে হয়, আলাদা করে—

জয়করণ বাধা দিয়া বলিল—না, না, এক সাথেই হোক না—যা খরচা হবে—

কিশোরী বলিল—বেশ, আমি অর্দ্ধেক দেব। আমার বাবাজি কিন্তু রসুই কর্ব্বে। তাহলে এখন উঠি।

জয়করণও উঠিয়া বলিল—চল না, আমিও যাব,—কোন কায ত নেই।

মক্কেলদের দুই একটি স্তোক বাক্যে বসাইয়া জয়করণ কিশোরীর অনুগমন করিল।

ট্রেন হইতে নামিয়া লীলাবতী কিশোরীলালের নিকট সব কথা শুনিয়া বলিলেন—কিন্তু আপনার ওখানে কি ঠিক হবে ?

জয়করণ আগাইয়া আসিয়া বলিল—কিশোরী থাক্‌বে আমার বাসায়, ও বাড়ী একেবারে ছেড়ে দিয়ে যাবে।

লীলাবতী বলিলেন—কিশোরীবাবুর বড় অসুবিধা হবে যে !

তার পর রামজনমের প্রতি কহিলেন—তাহলে চল আমাদের বাসাতেই নিয়ে যাই। একটু স্থানাভাব হবে বটে, তা'র আর কি করা যাবে।

কিশোরী বলিল—আমার বাসাতে কিন্তু সব ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে।

রামজনম ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—আমার বাসায় বড় কষ্ট হবে ওঁদের—

ফাগুনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল মাইজি, দুটো গাড়িতেই হবে, না বেশী চাই—

মিসেস লাল বলিলেন—গাড়ি তিনটে ঠিক কর্। আগে জিনিসপত্তর আমার বাসায় পাঠিয়ে দে।

রামজনম বলিয়া উঠিলেন—না, না—কিশোরীর বাসায় চল, আমি ভেবে দেখলাম সেই সব চেয়ে ভাল হবে।

একটা চাপা মৃদু হাসি লীলার ঠোঁটের উপর খেলিয়া গেল।

আকস্মিক বিপদ অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া এমনই আতঙ্কের সৃষ্টি করে, যাহার প্রভাব মনের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়া কিছুকাল যাবৎ স্থায়ী হইয়া রয়ে।

অযোধ্যাপ্রসাদ ও কতিপয় যুবক মনসারি গ্রামে আশ্রম-গৃহ পুনর্নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ভার লইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মহিলাদের মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া লীলাবতী সাধারণ সভায় ইহার বিপক্ষেই দাঁড়াইয়াছিলেন। অথচ অন্যত্র কোথায় যে আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে তাহাও নির্ণয় হইতেছিল না। এই সম্বন্ধে বিবেচনা ও অনুসন্ধানের পর আর একটি সভা আহ্বান করা স্থির হইয়াছিল। তত দিন সমিতির কার্য্য এক প্রকার স্থগিত রহিল। সহরে আসিয়াই আশ্রম-মহিলাগণ কিছু দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সভায় তাহা পেশ করিয়া লীলাবতী মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অচিরে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেবল সুমিত্রা কুঁয়র শারীরিক অসুস্থতার জন্য যাইতে পারিলেন না। বেলাও তাঁহার সহিত রহিয়া গেল।

ইহার কয়েক দিন পরে কিশোরী কোর্টে যাইবার পথে সংবাদ লইতে গিয়া দেখিল সুমিত্রার জ্বর আসিয়াছে। তিনি প্রলাপের

ঘোরে বকিতেছেন। রামবতিয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতেছে।

বেলা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। কিশোরীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—এই কতক্ষণ জ্বরটা বেশী হয়েছে, ফাগুনিকে পাঠিয়েছি ডাক্তারবাবুকে ডাকতে। ঐ ভুল বকা রাত থেকেই হয়েছে, কিন্তু তখন ত গা বেশ ঠাণ্ডা ছিল।

কিশোরী বৈঠকখানায় আসিয়া চিন্তিত ভাবে বসিয়া পড়িল। পিতার অজ্ঞাতসারেই সে এই বাসা মহিলাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়া স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিল, এই আশায় যে, স্বল্পকাল মধ্যে আশ্রমের আবাস অন্যত্র স্থির হইবে। কিন্তু তাহারও উপস্থিত প্রয়োজন ছিল না, যদি না সুমিত্রা অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। পিতার অসন্তোষের পাত্র হইবার আশঙ্কায় সে বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

বেলার কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। অলক্ষ্যে কখন আসিয়া সে একটা সোফায় বসিয়া ছিল।

কিশোরী ব্যস্ত ভাবে বলিল—কি বল্‌লে, সুমিত্রার বেমারি শক্ত ?

বার দুই মাথা নাড়িয়া বেলা নিম্ন স্বরে বলিল—ডাগ্‌দার বৈদ্ এর কিছুই করতে পারবে না।

বিস্ময়ের সহিত কিশোরী বলিল—কেন বল ত ?

কি যেন বলিবার চেষ্টা করিয়া মিনিট খানেক পরে বেলা আবার মাথা নাড়িয়া কহিল—সে আমি বল্‌তে পারব না !

কিশোরীর কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। সে আগ্রহ ভরে বলিল—আমার কাছে বল না, তাতে কোন দোষ নেই।

বেলা হাসিবার মত করিয়া বলিল—দোষ গুণের কথা ত নয়—

তাহার নিকটে আসিয়া কিশোরী বলিল—তবে?

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বেলা শুধু বলিল—ভয় করে!

আশ্চর্য্য হইয়া কিশোরী কহিল—ভয়? কিসের ভয় বেলা? বল না!

দরজার বাহির হইতে জয়করণ বলিয়া উঠিল—বাঃ কিশোরী, বেশ! এই জন্যে বুঝি সবের সকাল বেরিয়ে পড়?

অযথা একটু থতমত খাইয়া কিশোরী বলিল—নিশ্চয়ই! এঁদের সম্বাদ নেওয়া যে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় কায!

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একগাল হাসিয়া জয়করণ বলিল—তা'ত ঠিক! তার পর একটা চেয়ার দখল করিয়া দেওয়ালে লম্বিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—এখনও সাড়ে দশ বাজে নি, সময় আছে।

বেলা উঠিবার উপক্রম করিতেই জয়করণ বলিতে লাগিল—এঁরই তারিফ বুঝি তুমি সেদিন করছিলে, ইনিই বেলা দেবী? নমস্কার!

অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া কিশোরী কিছুই বলিতে পারিল না।

বেলা লজ্জিত ভাবে প্রতিনমস্কার করিতেই জয়করণ বিনীত

ভাবে বলিল—কিছু মনে করবেন না যেন! আপনার মকান শুনেছি রোস্‌নায়—আমার রহুয়ায়। ঠিক তার পাশেই! এক হিসাবে আমরা পরোশি বলা যায়। মাফ করবেন—আপনার পিতাজির নাম?

বেলা বলিল—বাবু সোনেলাল চৌধুরি—আপনি চেনেন?

জয়কিরণ সোৎসাহে বলিল—বাবু সোনেলাল? তাঁকে আর চিনি না? আমার বাবুজির যে বিশেষ বন্ধু! গত বছর আমার স্ত্রীর শ্রাধে তাঁকে শেষবার দেখেছি! তার পর আর—যাক্ সে কথা। আপনি ত তাহলে একরকম আমার ঘরের লোক!

কে তোমার ঘরের লোক হে ভায়া?—পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে আসিয়া ডাক্তার লাহিড়ী বলিলেন—ওঃ, বেলা? তা এ কথা ত আমার এত দিন জানা ছিল না।

সপ্রতিভ ভাবে জয়করণ বলিল—আমিও জানতাম না ডাক্তারবাবু। আলাপ কর্ত্তে গিয়ে এইমাত্র বেরিয়ে পড়লো—

লাহিড়ী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহলে সম্পর্কটা আবিষ্কার হল কি রকমের?

জয়করণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—সম্পর্ক এমন নিকট কিছু নয়।

ডাক্তার বলিলেন—তবুও দূর সম্পর্কের গোতিয়া বা দেয়াদ্ বটে ত?

জয়করণ যেন অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিল—না না, তা নয়—

লাহিড়ী তখন হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—উকীল মানুষ। তোমায় বেশী জেরা করা চলে না।—তার মানে সম্বন্ধটা বোধ করি তাহলে চেষ্টা করলে খুবই নিকট হয়ে পড়তে পারে—অর্থাৎ কি না, তোমাদের ভাষায় যাকে বলে বিয়া সাধির—

কিশোরী বলিয়া উঠিল—এই এতক্ষণে আপনি ঠিক ধরেছেন দাদামশাই!

দাদামশাই কি তামাসাই কর্বেন না সুমিত্রাদিকে দেখ্‌তে যাবেন—বলিয়া যেন রাগতঃ ভাবেই বেলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

লাহিড়ী হাসিয়া বলিলেন—নাতনীর রাগটি ত বেশ মিষ্টি! আর বলেছেও মিথ্যে নয়, বুড়ো মানুষের তামাসা কি শোভা পায়? কিন্তু ডাক্তার হলে যে ঘটকালী কর্ত্তে মানা, এমন কোনও আইনে কি লেখা আছে দিদি? জিজ্ঞাসা কর না জয়করণ বাবুকে!

১১

সুমিত্রার জ্বর যে সোজা পথ ধরে নাই, লীলাবতী তাহা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বদা চিন্তান্বিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু কিশোরীলালের অন্তরে তাহার চেয়ে অধিকতর ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল বেলার কথা—ডাক্তার বৈদ্য এই রোগ ধরিতে পারিবে না। তাই সপ্তাহ খানেক পরে ডাক্তার লাহিড়ী যখন রোগী পরীক্ষা কবিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—শেষে টাইফয়েডে না দাঁড়ায়, লীলা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—আমারও ঐ ভয় ছিল!

কিশোরী কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—টাইফয়েডের সব লক্ষণ পেয়েছেন কি?

ডাক্তার তাঁহার লম্বিত শুভ্র দাড়ির উপর হাত বুলাইতেছিলেন, গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—এখনও ঠিক করে কিছু বলা যায় না। তবে আমার মনে হয়, আকস্মিক আতঙ্ক এবং মানসিক উত্তেজনা রয়েছে এর মূলে। কোনও নিয়মিত ধারার মধ্যে জ্বরটা এখনও এসে দাঁড়ায় নি, কিন্তু পরিস্ফুট কয়েকটা উপসর্গ লক্ষ্য করে আমি চিকিৎসা করছি হোমিওপ্যাথি মতে।

লীলা বলিলেন—হাঁ, বিশেষতঃ এই রকম কেসে, যেখানে মস্তিষ্কের বিকারই রোগের বিশেষ লক্ষণ।

কিশোরী নিম্নস্বরে কহিল—কিন্তু টাইফয়েড যদি সত্য না হয়?

ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন—ঠিক সেই কারণেই ত হোমিওর প্রাধান্য ! টাইফয়েড না হলেও উপসর্গ অনুযায়ী রেমিডি নির্ব্বাচন করতে পারলে রোগের উপশমই হবে, অথচ অন্য প্রণালীতে প্রস্তুত মিশ্রিত ওষুধ হয়ত এ ক্ষেত্রে রোগটাকে ঠিকমত আয়ত্ত করতে না পেরে বাড়িয়ে তুলতেও পারে।

লীলাবতী এবার হাসিলেন এবং মুখ টিপিয়া বলিলেন—দাদা-মশাই যে হ্যানিমানের এত বড় শিষ্য তা' ত কোনও দিন জানতে পারি নি ?

ডাক্তার তন্ময় হইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, কথাটা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

কিশোরী একটু দ্বিধা করিয়া বলিয়া ফেলিল—আচ্ছা মনে করুন যদি এর মধ্যে কোন ভৌতিক ঘটনা সংশ্লিষ্ট থাকে, আপনার হোমিওপ্যাথি ত' তাহ'লে কিছুই করতে পারবে না ?

সহসা সোজা হইয়া বসিয়া ডাক্তার তাঁহার আয়ত চক্ষু দুটী আরও উজ্জ্বল করিয়া বলিলেন—সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্ম শক্তির বেশী প্রভাব। যাকে বোধ হয় শক্তিশালী অনুবীক্ষণে দেখা যায় না এমন পরমাণুর ক্রিয়া যে কী আশ্চর্য্যরূপে প্রবাহিত হয়ে যায় জীব-দেহে, অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ের মধ্যে, তা দেখলে মনে হয় যেন এর সঞ্চারের সঙ্গে ঐশ্বরিক শক্তির যোগ আছে !

লীলা মলিন হইয়া বিবর্ণ মুখে বলিলেন—তবে আপনারও কি রোগের কারণ তাই বিশ্বাস হয়েছে দাদামশাই ?

ডাক্তার মৃদু মৃদু দুলিয়া যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—অন্ধকারে আতঙ্ক, ভূতের ভয়, প্রলাপের ঘোরে চীৎকার, অস্থিরতা, মৃত্যুভয়—এ-সব উপসর্গ অনেক কমে গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে যেন অচৈতন্য ভাব, চোখ খুলতে চায় না, ভুল বকা, জ্ঞান হলেও ধারণাশক্তির অভাবে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না, একলা চুপচাপ পড়ে থাকতে চায়,—জেলস,—হঠাৎ ভয় পেয়েই এই রোগের উৎপত্তি—গোবিন্দ ভকতের সেই পোড়ো দালানে—

কিশোরী বলিয়া উঠিল—সেইখান থেকেই ত' ভূতে পেয়েছে !

ডাক্তার বলিলেন—তাই না কি ? তুমি দেখেছ সেই অপ-দেবতার চেহারা ?

পিছন হইতে বেলা বলিয়া উঠিল—উনি দেখবেন কি করে, সেখানে ত' তখন ছিলেন না। আমি বল্‌তে পারি—

তাহার দিকে না ফিরিয়া ডাক্তার বলিলেন—তুমি পার বেলা ? বেশ ! এ দিকে এস ত' !

বেলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—আগে বস। তোমার মুখে আজ তা'র রূপ-বর্ণনা শুন্‌বো।

কৌচের উপর বসিয়া মিনিট কয়েক ইতস্তত করিবার পর বেলা বলিল—আমি নিজে কিছু দেখিনি, তবে সুমিত্রা-দি'র মুখে যা শুনেছি—

কিশোরীর প্রতি ডাক্তার বলিলেন—তোমাদের আইনে

বোধ হয় এ রকম উক্তিকে কোনও প্রমাণের অন্তর্ভূত করা যায় না ?

কিশোরী বলিল—না-হাঁ—তবে—

ডাক্তার বলিলেন—তার পর বেলা, সুমিত্রা কি দেখেছেন ?

বেলা কিন্তু আর কিছুই বলিতে পারিল না। নতমুখে আঁচলের খুঁট লইয়া কেবল নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

লীলা বলিলেন—বল না বেলা, দাদামশাইএর হয়ত ওষুধ দেবার সুবিধা হতে পারে।

বেলা সেইরূপ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে ফাগুনি আসিয়া জানাইল—কোনও আদমি ডাক্তার সাহেবকে তলাস করিতেছে।

সুতরাং সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

ডাক্তার উঠিতে উঠিতে বলিলেন—আমার পাওনা কিন্তু বাকি রইল, মনে থাকে যেন বেলা! কাল না হয় দিনের আলোতেই এসে তোমার কাহিনী শুনে যাব।

১২

ফাল্গুনের চাঁদিনী রাত। বাগানের যে অংশে গোলাপের শ্রেণী প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, বেলা তাহারই মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া এক একটা ফুল, কখনও সন্তর্পণে তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ, আবার কোনটা বা আঘ্রাণও করিয়া দেখিতেছিল।

মাতৃহীনার মত অভাগী এ সংসারে আর কেহ নাই। সারাদিন ধরিয়া সকল চিন্তার ধারা এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বেলার মনকে আজ বিরস বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়া যাইবার মত কোন আকর্ষণ সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, অথচ এখানেই বা কত দিনে কি কায হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

কত সাধ্য সাধনার পর পিতাকে সম্মত করিয়া সে গৃহের বাহির হইয়া আসিয়াছে দেশের কাযে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া সকল দুঃখ জ্বালা হইতে আত্মবিস্মৃত থাকিবার দুরাশায়। কিন্তু তাহাও কতটা কি সফল হইয়াছে, এখানে আসিয়া সে কি পাইয়াছে ও কি হারাইয়াছে, সেই সব হিসাব নিকাশ করিতে আজ সমস্ত দিনটা কাটিয়াছে। অথচ সন্তোষজনক কিছু নিষ্পত্তি হয় নাই। অবশেষে বিকাল হইতে উৎকট মাথার যন্ত্রণায় তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

অভিজ্ঞতার মূল্য

অসুস্থা সুমিত্রার পরিচর্য্যায় কয়েক দিন যাবৎ লীলাবতীর সহিত তাহাকে রাত্রির এক অংশ জাগিতে হয়, অপরাংশে কিশোরী বা জয়করণ ও রামবতিয়া থাকে। কিন্তু দিবানিদ্রা কোনও কালেই তাহার অভ্যাস নাই।

মনোমত একটা গোলাপ বাছিয়া তুলিয়া লইয়া বাগানের বেঞ্চের উপর বসিয়া সে ভাবিতেছিল কাব্যের নামে আগেকার মত আর সে আনন্দ পায় না কেন? কেন তাহার এমন দুরবস্থা হইল? কি সে চায় এবং পায় না তাহারই অনুসন্ধান—

সহসা পিছন হইতে দুই হাতে কে তাহার চোখ দু'টি চাপিয়া ধরিল।

একবার মনে পড়িয়া গেল প্রিয়সখী সোহাগীয়ার কথা। এমনই করিয়া সুযোগ পাইলেই তাহার চোখ টিপিয়া সে ধরিত। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, না—সে এখানে কি করিয়া আসিবে? লীলাদি হইতেই পারে না। তবে? ভীতকণ্ঠে বেলা বলিল—কে?··· চকিত মধ্যে লোকটা যে কোথায় মিলাইয়া গেল, বেলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

বেঞ্চের পশ্চাতে অদূরে একটা বিশাল কাঁটাল গাছ ছিল, সম্ভবতঃ তাহারই আড়ালে সে লুকাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বেলার মুখ দিয়া এমন স্বর ফুটিল না যে কাহাকেও ডাকে। ক্রমেই সাহস হারাইয়া কেমন হইয়া সে বসিয়া পড়িল।

ভারি জুতার ও লাঠির শব্দ করিতে করিতে রামজনম ফটক



পার হইয়া বেঞ্চের দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিয়া উঠিলেন—আজকাল ঘরকন্নার কথা একদম ভুলে বসে আছ দেখছি। রাত দশটা বাজে এখন পর্য্যন্ত খেয়ালই নেই!

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—কিশোরীর কি হয়েছে বল ত, কোর্টে যাওয়াও ছাড়লে? নিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন আরে; এ যে বেলা! তুমি একলা?

বেলা কিছুই বলিল না।

রামজনম ফিরিলেন, কিছুদূর যাইয়া বলিলেন—এদের কিছুই বুঝতে পারি না, এত রাত্রে বেলা এই নির্জ্জন বাগানে একলা বসে ·· কথাও কইলে না···

ফটকের নিকট হইতে ডাক্তার লাহিড়ী বলিয়া উঠিলেন—ব্যাপার কি? কে কথা কইলে না মোক্তার সাহেব?

দালানের বাহিরে আসিয়া লীলাবতী তাড়াতাড়ি বলিলেন—শীগগীর করে আসুন, দাদামশাই—

তাঁহার কণ্ঠস্বরে ব্যস্ত হইয়া বেলা উঠিয়া পড়িল। তার পর একদৌড়ে নিকটে আসিয়া বলিল—কি লীলাদি? ডাক্তারও ততক্ষণে দালানে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—কেন বল ত? লীলা বলিলেন—চলুন না দেখবেন।

তিনজনেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে রামজনম কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে চাপাস্বরে বলিলেন—না, আজ এর বোঝাপড়া করতেই হবে।

অভিজ্ঞতার মূল্য

একটা সিঁড়ি উঠিতেই পিছন হইতে জয়করণ বলিয়া উঠিল—কার সঙ্গে বোঝাপড়া মোক্তার সাহেব ?

তাহার দিকে ফিরিয়া রামজনম বলিলেন—এই যে, তুমি কোথা থেকে ?

জয়করণ বলিল—বাঃ, আমি ত প্রায়ই রাত জেগে সুমিত্রাদির সেবা করতে আসি। আপনি যে এত রাত্রে ?

একটু শ্লেষের সহিত রামজনম কহিলেন—আমি তদারক করতে এসেছি কে কেমন রোগীর সেবা করছে।

তবে আসুন—বলিয়া জয়করণ হাসিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিল। রামজনমও মন্থর গতিতে তাহার অনুগমন করিয়া বলিলেন—আগে ডাক ত এবার কিশোরীকে। তার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আচ্ছা বসুন—বলিয়া জয়করণ একটা চেয়ার দেখাইয়া দিল। রামজনম বসিলেন দেখিয়া জয়করণ ভিতরে চলিয়া গেল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক কাটিয়া গেলেও যখন কেহ বাহিরে আসিল না তখন সম্পূর্ণ ধৈর্য্যহারা হইয়া রামজনম সশব্দে রোগীর দরজার নিকট গিয়া হাঁক দিলেন—কিশোরী !

অচৈতন্য সুমিত্রার শয্যাপার্শ্বে ডাক্তার একটা চেয়ারে বসিয়া তাহার নাকের কাছে ছোট ঔষধের শিশি ধরিয়া ছিলেন। রামবতিয়া পায়ে মালিশ করিতেছিল।

লীলাবতী শিয়রে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে রামজনমের দিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন—চুপ !

বেলা কাঁচের গ্লাসে ঔষধ লইয়া হাতে চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ডাক্তার সঙ্কেত করিতেই সে সন্তর্পণে সুমিত্রাকে তাহা খাওয়াইয়া দিল।

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া লাহিড়ী বলিলেন—ব্যস, আর ভয় নেই! বেলা তুমি মাথায় বাতাস কর। চল আমরা বাইরে যাই, লীলা।

লীলাবতী সোজা বৈঠকখানায় গিয়া একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িলেন।

রামজনম তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া কহিলেন—কিশোরী কই?

লীলা চোখ বুজিয়া ছিলেন, সেই ভাবেই বলিলেন—দুপুরে তিনি বাড়ী চলে গেছেন, জ্বর গায়ে!

এমন সময় ডাক্তার বলিতে বলিতে আসিলেন—খুব সময়ে যাহোক খবর দিয়েছিলে লীলা। এমন বেয়াড়া তালে এই ফিটটা এসেছিল যে বাস্তবিকই রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছিল আর কি! যাক্ সে ভাবটা বেশ কেটে গেছে এখন!

জয়করণ আসিয়া বলিল—আজকের রাত একটু সতর্ক থাকতে হবে ত?

ডাক্তার বলিলেন—বেশী নয়, দুপুর রাত পর্য্যন্ত। মোক্তার সাহেব লীলাকে নিতে এসেছেন বুঝি?

রামজনম বলিয়া ফেলিলেন—না, না, তা নয়—রাত জেগে

সেলাইটা টেবিলের উপর রাখিয়া, মুখ তুলিয়া বেলা বলিল—আচ্ছা কাল ত শনিবার, কাল গেলে হয় না? চিঠি এখনও লেখা হয়নি—

জয়করণ বলিল—আজই যাওয়া উচিত, কিন্তু তুমি—আপনি যদি বলেন ত কালই যাব।

বেলা হাসিয়া ফেলিল। জয়করণের চোখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—কেন বল—বলুন ত?

এবার জয়করণের হাসির পালা। সে কিন্তু তাহা চাপিয়া আড়ষ্টভাবে বলিল—বল্‌তে সাহস হয় না—

বেলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—তবে ওকালতি চলে কেমন করে?

জয়করণ বলিল—সেখানে সুবিচার হয়—

বেলা বলিল—এখানেও হবে না—তাই বা কি করে জানলে—ন?

জয়করণের মুখে হাসি ফুটিল—হবে কি করে জানব?

এ কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে,—না দেওয়াই বোধ হয় ভাল। তাই বেলা চুপ করিয়া গেল।

জয়করণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল বেলার মুখের ভাব নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল! সে সাহস পাইয়া কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—বাঃ বেশ ফুল তোলা হয়েছে ত?

বেলা এবারও কোন উত্তর দিল না। এই সময় রামবতিয়া দরজার নিকট হইতে হাঁকিয়া বলিয়া গেল—সুমিত্রা মাইজি ডাক্‌ছেন।

বেলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

জয়করণ বলিল—আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি, একটা কায—

বেলা জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু কতক্ষণের জন্য শুনি?

জয়করণ বলিল—এই আধঘণ্টা?

টেবিলের উপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বেলা বলিল—বেশ!

জয়করণ বাহির হইয়া গেল। বেলা কিন্তু আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল।

অবশেষে চমক ভাঙ্গিল তাহার লীলাবতীর কণ্ঠস্বরে—কি ভাবছ বেলা?

বেলা উঠিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু তাহার চোখে জল, মুখে কথা নাই।

সামনের চেয়ারে বসিয়া লীলা বলিলেন—সুমিত্রা তোমায় ডেকে সাড়া পাচ্ছেন না, কি হয়েছে তোমার?

একটু পরে বেলা বলিল—এইমাত্র ত' রামবতিয়া এসেছিল, আমি এই ফুলটা সেরেই যাব মনে কচ্ছিলাম।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বেলা আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, কারণ তাহার পর এ পর্য্যন্ত সে সত্যই কাযে হাত দেয় নাই। ঘড়ির উপর নজর পড়িতেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে ইতিমধ্যে

কথন প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে! তখন আর এক ভয় তাহাকে পাইয়া বসিল, যদি এই সময় জয়করণ আসিয়া পড়ে?

আবার পরক্ষণেই মনে হইল—আসে ত কি হইবে? সে কী এমন অন্যায় করিয়াছে, যাহার জন্য এত ভয়? এতটুকু স্বাধীনতা কি তাহার থাকিতে নাই?

লীলা বলিলেন—ব'সো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেলা বসিলে লীলা বলিতে লাগিলেন—সুমিত্রা বোধ হয় তিন চার দিন পরেই বাড়ী চলে যাবেন। তুমি এখন থাক্‌বে না কি?

বেলা বলিল—আপনি কি বলেন?

লীলা একটু ভাবিয়া বলিলেন—আমার মনে হয় তুমিও এখন বাড়ী যাও। আবার যখন আশ্রমের কায আরম্ভ হবে, তখন সকলকেই খবর দেবো, তোমার ইচ্ছা হয় এসো।

বেলা সংক্ষেপে বলিল—একবার বাড়ী গেলে, আর আসা বোধ হয় আমার হবে না।

টেবিলের উপর হইতে সেলাইটা তুলিয়া লইয়া তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া লীলা বলিলেন—তোমার তাহলে এখন যাবার ইচ্ছা নেই।

বেলা ইহার কোন উত্তর দিল না।

ক্ষণপরে লীলা বলিতে লাগিলেন—এখন ত কোন কায হচ্ছে না, তাছাড়া তুমি একলাই বা কি করবে?

বেলা বলিল—কেন, যে সব কায আগে করেছি, তাই করবো।

লীলা হাসিলেন—তুমি একলা কি করে কর্ব্বে ?

বেলা যেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন আপনি কি আশ্রমের কায ছেড়ে দিচ্ছেন ?

সহসা ইহার উত্তর লীলা দিলেন না। পরে কহিলেন—আমার কথা ত হয়নি বেলা !

বেলা তৎক্ষণাৎ বলিল—কেন্ হবে না তাও ত জানি না।

লীলা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সেই নম্র লজ্জাশীলা বেলার আজ এ কী পরিবর্ত্তন ! তাঁহার রাগও হইল, তথাপি সংযত হইয়া উত্তর দিলেন—আমার কথা যদি জান্‌তে চাও ত এইমাত্র বল্‌তে পারি যে, নানা কারণে আশ্রমের কায উপস্থিত চালান সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। তাই আমি অবসর নেব মনে করছি।

বেলা বলিয়া উঠিল—কি কারণে আশ্রম চল্‌বে না ?

একটু চিন্তা করিয়া লীলা বলিতে লাগিলেন—এই কথাটা কিছুদিন থেকে তোমায় বলব মনে করেছি, কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠেনি। এ সব কায, শেষ পর্য্যন্ত, শুধু মেয়েদের দ্বারা, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। এর মধ্যে পুরুষদের টান্‌তেই হয়, তা না হলে চলে না। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সে রকম ভাবে মেলামেশার উপযুক্ত হয়ে শিক্ষিত ও সংস্কৃত আমরা সকলেই এখনও হয়ে উঠ্‌তে পারিনি। তাতে করে—

বেলা বলিয়া উঠিল—যাঁরা পারেন নি তাঁদের বাদ দিয়ে কায চলুক।

লীলা বলিলেন—তাতে বোধ হয় অনেকেই বাদ 'পড়ে যাবেন, হয়ত তুমিও—

মুহূর্ত্তে বেলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বেশ, তাহলে আমাকে আজই বিদায় করে দিন্। দরজার নিকট একটা ছায়া পড়িয়া সরিয়া গেল।

লীলা সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কে?

কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বেলা ক্ষিপ্রহস্তে টেবিল হইতে জিনিসপত্র তুলিয়া লইয়া নিজের চামড়ার সুটকেসে গুছাইয়া তুলিতে লাগিল।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি যাবে কখন, কার সঙ্গে—

মুখ না ফিরাইয়াই দৃঢ়স্বরে বেলা উত্তর দিল—কেন এই এগারটার ট্রেনে, জয়করণ বাবুর সাথে!

১৪

ভোরের আলো তখনও ভাল করিয়া ফুটে নাই, নিবিড় সুপ্তির অবসানে আধ-আবেশে-জড়িত প্রকৃতি !

সমস্ত রাত্রি দুর্ণিবার অস্বস্তি ও অনিদ্রায় কাতর লীলাবতী নিতান্ত অতিষ্ঠ হইয়াই বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রাতঃ-স্নানান্তে গরদের ধুতি পরিহিত ডাক্তার লাহিড়ী, বাসার সম্মুখের বাগানে, নিজমনে গুন্ গুন্ করিয়া, একটি ছোট সাজিতে ফুল তুলিতেছিলেন।

অদূরে আসিয়া লীলা ডাক দিলেন—দাদামশাই !

মুখ তুলিয়া চাহিয়া ডাক্তার লাহিড়ী বলিলেন—এই যে দিদি, এস ! খবর সব ভাল ত ?

লীলা শুধু উত্তর দিলেন—ভাল। হাত দিয়া দেখাইয়া লাহিড়ী বলিলেন—ঘরে গিয়ে ততক্ষণ ব'স। আমার হয়ে গেছে, সাজিটা রেখেই আস্‌ছি।

মিনিট কয়েক পরে বৈঠকখানায় আসিয়া লীলাকে দেখিতে না পাইয়া লাহিড়ী বলিলেন—কই, কোথায় গেলে !

দরজার নিকট আসিয়া লীলা বলিলেন—বেশ লাগ্‌ছে, ভোরের এই স্নিগ্ধ বাতাস !

লাহিড়ী বলিলেন—এস, ঘরের ভেতরে বসা যাক্। বাতাস খাওয়া অনেক হয়েছে !

ইতস্ততঃ করিয়া লীলাবতী বলিলেন—বস্‌তে আপত্তি নেই, কিন্তু এখন যে আপনার পূজার সময়!

লাহিড়ী বলিলেন—তাতে কি হয়েছে।

লীলা তখন ঘরে আসিয়া বলিলেন—আপনি না হয় পূজা সেরে আসুন, আমি ততক্ষণ বসছি।

একটা কাঠের চেয়ার টানিয়া লইয়া লাহিড়ী বসিয়া বলিলেন—তা কি হয় দিদি, সে অনেকক্ষণ। তুমি বসে থাকবে ততক্ষণ একলা এইখানে, আর আমি যাব ঠাকুর-ঘরে পূজো কর্ত্তে?

লীলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—তাতে কি হবে?

মৃদু হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন—তাতে হবে এই যে, ধ্যানে বসে চোখ বুজে দেখবো তোমার স্বরূপ, প্রাতঃ-গায়ত্রী যাব ভুলে! তার চেয়ে তোমার ঊষা-সৌন্দর্য্য পান করে নিয়ে, তৃপ্ত হয়ে তবে পূজা-পাঠে মন দেওয়া যেতে পারে!

লীলা লজ্জায় জড়সড় হইয়া বলিয়া উঠিলেন—দাদামশাই কি যে বলেন!

লাহিড়ী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—দাদামশাই যা বলেন তাতো শুনলে, এবার তুমি কি বলতে এসেছ তাই শুনি? তোমার শরীর ভাল ত?

লীলা তখন বেলার সব কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া শেষে ব্যথিত স্বরে কহিলেন—কি আশ্চর্য্য বলুন ত! আমি

কোনও দিনই ভাবতে পারিনি এত বড় আঘাত বেলা আমায় দিতে পারে!

তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া ডাক্তার সমবেদনার স্বরে বলিলেন—আঘাত তুমি পেয়েছ দেখছি সত্যিই, কিন্তু পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার অনুপযুক্ত করে আশ্রমের কায থেকে বাদ দিতে চেয়ে তাকে যে দুঃখ তুমি দিয়েছ তাও ত কম নয় লীলা!

লীলা ইহার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু লাহিড়ী বলিতে লাগিলেন—পর্দ্দার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে আরও পাঁচজনের সঙ্গে যখন এই বেলাকে তোমরা সাদরে আমন্ত্রণ করে এনেছিলে, তখন কি তাকে নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলে যে তার স্বাধীনতার পরিধি কতটা, যার বাইরে গেলে সে দণ্ডনীয় হবে? সুতরাং অকস্মাৎ অপমানিত বেলার সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরে যাওয়ার সংকল্প খুবই স্বাভাবিক এবং পথের জন্য জয়করণবাবুকে তার সঙ্গে নেওয়া হয় ত সকলের চক্ষে বেশ শোভন না হলেও সহজ হয়েছিল।

লীলা বলিলেন—কিন্তু, ধরুন যদি আমরা জয়করণবাবুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি?

ডাক্তার উত্তর দিলেন—তা হলে দোষ আমাদেরই, বেলাকে তাঁর সঙ্গে মেশবার সুযোগ দেওয়া।

লীলা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—কিন্তু কোনদিনই আমি বেলাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে বলিনি।

কিন্তু মানাও ত করে দাও নি ; তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছ পর্দ্দার বাইরে এনে।

কিন্তু আমিও ত পর্দ্দা মানিনে, তাই বলে কি সকলের সঙ্গে কথা কই ?

না কইতে পার, কিন্তু কেন কও না সে তুমিই জান, নিষেধও ত নেই।

নিরুপায় হইয়া লীলা বলিলেন—এতটুকু বিচার বিবেচনা সকলেরই থাকা উচিত।

মাথা নাড়িয়া ডাক্তার বলিলেন—তুমি এইখানেই ভুল বুঝেছ লীলা। বিচার বিবেচনা বা রুচি সকলের সমান হয় না। যার যেমন, সে তেমনই কায করবে। ডাঙ্গার মানুষ যখন প্রথম জলে নামে, তখন এ ধারণা হয় ত তার না থাকতে পারে যে, হঠাৎ বেশী এগিয়ে পড়লে ডুবে যাবার ভয় আছে। তারপর সাঁতার শিখতে পারে ভালই, না পারে দু-একবার তলিয়ে গিয়ে অন্তত এই শিক্ষা তার লাভ হয় যে কোথায় তার সীমা, যার আগে সাঁতারি না হয়ে পা ফেলা নিরাপদ নয়।

লীলা বলিতে লাগিলেন—আমার মনে হয় স্বাধীনতা পাবার আগে আমাদের যেমন শিক্ষিত হওয়া দরকার তেমনি বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।

ডাক্তার এইবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বিস্মিত হইয়া লীলা বলিলেন—আপনি হাসছেন যে ?

জানেন না আপনি, মেয়েদের দেহে এমন শক্তি থাকা চাই—

ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন—বেশ এবার আশ্রমের প্রধান অঙ্গ হবে তা হলে ব্যায়াম-সমিতি? সুসংবাদ! আজ তা হলে এই পর্য্যন্ত—পূজা সেরে যেতে হবে অনেক দূর।

লীলা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—ভাল কথা, কিশোরীবাবু কেমন আছেন?

—আজ ঠিক বলতে পারিনে—

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া লীলা বলিলেন—কেন, অবস্থা কি ভাল নয়?

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিলেন—রোগ কঠিন বোধ হয়, তবে ভয়ের এখনও কিছু হয় নি।

মিনতি স্বরে লীলা বলিলেন—আপনার সঙ্গে একবার দেখতে যাব দাদা!

সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তার বলিলেন—বেশ ত, যেও দিদি! কাল কি পরশু যখন আমি যাব—কিন্তু তার আগে ডাক্তার সাহেবের অনুমতিটা নিয়ে রেখো। বলিয়া অর্থব্যঞ্জক ভাবে একটু হাসিলেন।

১৫

ডাক্তার লাহিড়ীর সহিত কথা-প্রসঙ্গে লীলাবতী উত্তেজনাবশে যে মূল সূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, আজ সকাল হইতে একাকী সেই বিষয় চিন্তা করার ফলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া বেলার চেয়ে জয়করণের অপরাধই প্রকৃত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তখন তাড়াতাড়িতে সঠিক জবাব দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এই কথাই তাঁহার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, মানুষকে চিরদিন ডাঙ্গায় আটক রাখার জন্য দায়ী কে এবং কিসের জন্যই বা জলে নামা আপদজনক হইয়াছে?

দাদামশাই বেলার স্বপক্ষে যত কিছুই বলুন না কেন, এবং বেলা যতই নিরপরাধ হউক না কেন, জয়করণবাবুকে কিন্তু কিছুতেই ক্ষমার চক্ষে দেখা যাইতে পারে না। অথচ মুস্কিল হইয়াছে এই যে, কখন কোন্ অবসরে যে সে কি করিয়া বসিয়াছে তাহাও সঠিক জানিতে পারা যায় নাই। তথাপি তাহার প্রায় প্রতি কার্য্যই সন্দেহের ছায়াপাত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্রমের একজন প্রধান কর্ম্মীও ত আছেন—এই কিশোরীবাবু—তাঁহার সম্বন্ধে এমন কথা কোনও দিন মনের কোণে উদয় হয় নাই কেন? সুতরাং শিক্ষা সংস্কারের কথা বাদ দিলেও এই অন্যায়ের মূলে—

ফাল্গুনি আসিয়া কহিল—মাইজি; তরকারি বানান হোল?

চুলার আঁচ যে আর নেই—সাড়ে নয় বাজে গেছে! বঁটি ফেলিয়া দিয়া লীলা রাগ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—কেন রে ফাগুনি, এ কাযটাও তুই করতে পারিসনে? আমি একলা কত দিক দেখি বল্ তো?

আশ্চর্য্য হইয়া ফাগুনি বলিল—আমি ত কোনও দিন ওজর করিনি মাইজি—তাহলে বানিয়ে নিই?

উঠিয়া দাঁড়াইয়া লীলা বলিলেন—হাঁ তাই নে বাপু। আর বাবাজির তিনদিন ছুটি ত পরশু হয়ে গেছে? আজই একটা বাবাজি ধরে নিয়ে আয়। আমার শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে—দিন কতকের জন্যে কার্সিয়ংএ আমি শীঘ্রই যাব।

ফাগুনি ততক্ষণে আলু ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল—বাবাজির কি কমি আছে মাইজি, সাঁঝেই একটা ধরে আন্‌বো। কিন্তু আমিও রসুইএর কাম ভালই জানি, আর এ তো দু-তিন জনের—এ-বেলা আমিই তরকারিটা—

লীলা বলিয়া উঠিলেন—তুই জানিস্ রাঁধতে? বেশ ত, দেখি আজ তোর কেমন রসুই! আমার মাথাটা বেজায় ধরেছে, যাই একটু শুয়ে পড়ি গে।

উৎফুল্ল হইয়া ফাগুনি বলিল—কোই হরজ নেই মাইজি!

শোবার ঘরের পরেই বাহিরের দালানে রামজনম মক্কেল লইয়া কাযে ব্যস্ত ছিলেন। বিছানায় বসিয়া লীলা জানালা দিয়া তাহাদের একবার দেখিয়া লইয়া সেটা বন্ধ করিতে যাইতেছেন,

এমন সময় সামনের রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়াইল এবং তাহা হইতে অযোধ্যাবাবু নামিয়া পড়িলেন—পরণাম মোক্তার সাহেব, কুশল মঙ্গল ?

লীলা তাড়াতাড়ি জানালা দরজা সব বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। আজ আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না ; বিশেষতঃ আশ্রমের কোন কথা মনে হইলে একটা অব্যক্ত বেদনায় অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না—দেহযন্ত্রেরও কোথায় কি যেন একটা আল্‌গা হইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য অশান্তির অবধি ছিল না। সহসা একটা কথা কানে যাইতে লীলা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

অযোধ্যা বলিতেছেন—কিশোরীর বেমারি শক্ত।

রামজনম জিজ্ঞাসিলেন—কোন্ বেমারি ?

অযোধ্যা বলিলেন—তা ঠিক জানি না, তবে শুনলাম, হালৎ ভাল নয়।

অযোধ্যা উঠিয়া পড়িলেন—আমায় এই ট্রেনেই যেতে হবে !

কিছুক্ষণ পরে রামজনম হাঁকডাক করিয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়া লীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—আর দেরী করলে চলবেনা, একটা বড় কেস্ আছে যা'তে অপর পক্ষ হ'তে এক নামী ব্যারিষ্টার এসেছেন।

অভিজ্ঞতার মূল্য

ফাগুনি ছুটিয়া আসিয়া জানাইল যে মাইজির মাথার যন্ত্রণা হইতেছে, তিনি ঘুমাইয়াছেন।

বিছানায় পড়িয়া লীলা সবই শুনিতেছিলেন, একবার উঠিয়া বসিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন।

আহারাদির পর পাশের ঘরে রামজনম কাছারির পোষাক পরিতেছেন, দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে লীলা আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিলেন।

রামজনম বলিলেন—মাথা ছাড়লো?

লীলা ছোট একটি ঘাড় নাড়িলেন।

রামজনম বলিতে লাগিলেন—আজ আমার আস্‌তে দেরী হতে পারে। হাকিম যদি শহর-জমিনে যান—ছটা সাতটাও বাজতে পারে।

অধোমুখে বসিয়া লীলা বলিলেন—আজ আমিও এক জায়গায় যাব—ফিরতে হয় ত সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

রামজনম উঠিয়া পড়িলেন—আজ না হয় থাক্; মাথা ধরেছে—বলিয়া অগ্রসর হইতেই লীলা কম্পিতস্বরে বলিলেন—না, আমি যাব।

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রামজনম কহিলেন,—আচ্ছা, যেও। এত তাড়া কেন বল ত?

উদ্গত অশ্রু চাপিয়া সেই ভাবেই লীলা উত্তর দিলেন—হয়ত আর দেখ্‌তে পাব না তাই···কিশোরীবাবুকে দেখ্‌তে যাব।

··· ··· ··· ··· ···

অভিজ্ঞতার মূল্য

বিকালের দিকে পরিচিত হর্ণের শব্দে লীলাবতী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই ডাক্তার লাহিড়ীর মোটর রাস্তায় দাঁড়াইল।

গাড়িতে উঠিতে উঠিতে লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ কেমন আছেন?

ডাক্তার বলিলেন—ফাগুনির জোর তাগাদার চোটে আস্‌তে হ'ল, নইলে আজ আর তোমায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না।

পিছনের সীটে বসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি এমন রোগ দাদামশাই? আপনি কি একটুও আশা দিতে পারেন না?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—আশা দেবার মালিক ত আমরা নই দিদি! তাঁর কৃপা থাকে ত ভাল হবে, তবে রোগ কঠিন বটে, মেনিন্‌জাইটিস্‌। ক্ষণপরে আবার বলিলেন—জ্ঞান একেবারেই নেই, কিন্তু একটু সাম্‌লে উঠলেই হ'তে পারে। তবে কোন রকম উত্তেজনা না হয় সে বিষয়ে তোমাদের সতর্ক থাক্‌তে হবে।

১৬

বাবু মহাদেবপ্রসাদ মোক্তারের বাটিতে সেদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীসত্যদেবনারায়ণ পূজা উপলক্ষে সহরের ভদ্র অভদ্র বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বহিরাঙ্গনে কয়েকটা বাঁশের উপর একটি সামিয়ানার মত রঙ্গিন চাদর খাটাইয়া, তাহারই নিচে পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মধ্যস্থলে এক বেদীর চতুষ্পার্শ্বে কদলিস্তম্ভ শোভা পাইতেছিল এবং তাহার সম্মুখে সপুরোহিত মহাদেব হভন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

অপর দিকে অদূরে দালানের উপর ফরাসে এবং নিচে চেয়ার বেঞ্চের উপর নিমন্ত্রিতজনের সমাবেশ হইয়াছিল। খোস গল্প, হাসি তামাসা পূরাদমেই চলিতেছিল; এমন সময় এদিকে কথা আরম্ভ হইতেই দালানের মাঝখানে গ্রামোফোনে বিকৃত আওয়াজ করিয়া অস্পষ্ট স্বরে বাজিয়া উঠিল—শ্রীসত্যদেবের কথামৃত!

কলরব সবেমাত্র মন্থর হইয়া আসিয়াছে, এই সময় সহসা জয়করণের আবির্ভাবে কয়েকজন অভিনব উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

জয়করণ নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বে একজন উঠিয়া গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া সভামধ্যে উপস্থিত করিল।

মুরলীমনোহর বলিয়া উঠিলেন—কোন্ আস্‌মান থেকে উতরে এলে ভাই, হুরীর রাজ না পরীর ?

তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া একজন কানে কানে কি একটা কথা বলিতেই পার্শ্বস্থ সকলেই খুব খানিকটা হাসিয়া লইল।

ব্রিজবিহারী সহাস্যে বলিতে লাগিলেন—ভায়ার বোধ করি দিন ছয়েক হোল বেলা দেবীর সহিত তিরোধান্ হয়েছিল ? কোর্টসিপের পালা এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল ?

জয়করণ যেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ছদিন হয়ে গেছে ? আমার মনে হচ্ছে যেন এই কাল কি পরশু !

রামপদারথ কহিলেন—তা'ত মনে হবেই। এখন যে গভীর অনুরাগে একেবারে ডুবে তলিয়ে রয়েছ ! কিন্তু আসল কাযের কতদূর ?

বিস্মিত হইয়া জয়করণ বলিল—আসল কায ?

আবার হাস্যের একটা প্রবল তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং অনেকেই নানা প্রকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ছোটেলাল কি একটা ইঙ্গিত করিয়া নিম্নস্বরে বলিতেই আবার হাসির রোল উঠিল। তাহা কতকটা প্রশমিত হইয়া আসিলে মুরলীমনোহর দুই হাত তুলিয়া বলিলেন—আহা, চুপ করুন আপনারা, আগে ব্যাপারটা শুনতে দিন্। তারপর জয়করণকে বলিলেন—ভোজটা তা হলে এই মাসেই হচ্ছে ত ?

জয়করণ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—তা আমি কিছুই জানি না।

রামপদারথ কহিলেন—জানেন না বই কি! তিলক কত স্থির হয়েছে?

জয়করণ যেন লজ্জিত হইয়া বলিল—তা আমি কি করে বলব?

মুরলীমনোহর বলিয়া উঠিলেন—আপনারা থামুন একবার। আচ্ছা, তোমার বাবুজি কত বলেছেন?

জয়করণ একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—বাবুজি না কি চার হাজার বলেন, ওরা তিন হাজার পর্য্যন্ত রাজি হয়েছে। আমি কিছুই বলিনি—

ব্রিজবিহারী বলিলেন—তাই বুঝি বেগতিক দেখে পালিয়ে এলে?

রামপদারথ বলিয়া উঠিলেন—আসনাই করে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মাঝ-দরিয়ায় ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছ, এই বুঝি তোমার প্রেম? তখন কত রকম ভাবের গল্পই না করা হোত?

পুরোহিত একটি থালার উপর আরতির প্রজ্বলিত কর্পূর দীপ লইয়া আসিলে সকলে একে একে সেই দীপশিখা দুই হাতে আচ্ছাদন করিয়া মস্তকে গ্রহণ ও সেই পাত্রের উপর পয়সা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ বা তাহা হইতে আনি দুয়ানি ভাঙ্গাইয়া লইয়া পয়সা দিতেছিলেন। পুরোহিত অন্য দিকে

চলিয়া গেলে ব্রিজবিহারী বলিতে লাগিলেন—আমি তখনই বলেছিলাম জয়করণ যখন হাত দিয়েছে তখন উদ্ধার না করে ফিরবেনা—

জয়করণ আপত্তির স্বরে বলিল—আমি আর কি করেছি বল ?

মুরলীমনোহর বলিলেন—নাঃ, তুমি কিছুই করনি, কিছুই জান না। বলি সাড়ে-তিন হাজারে রফা হবে ত ?

জয়করণ বলিল—সে জানেন বাবু সোনেলাল চৌধুরী।

রামপদারথ বলিলেন—আমরা তখন বিশ্বাস করতে চাইনি, কিন্তু কিশোরী বল্‌তো কথা মিথ্যে নয় !

ব্রিজবিহারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আহা বেচারি আজ কেমন আছে, কি জানি ?

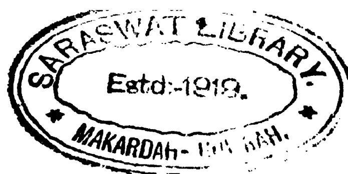
জয়করণ তখন বলিল—আমি ত আসছি সেইখান থেকেই !

অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করিলে জয়করণ বলিতে লাগিল— কাল রাত বারটার সময় নাকি একেবারে শেষই প্রায় হয়ে গিয়েছিল। ভোর রাত থেকে আবার একটা সুরাহা বোধ হচ্ছে। তবে এখনও কিছু বলা যায় না। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী দেবী ও মিসেস্ লীলা ! ডাক্তার লাহিড়ী বল্‌লেন— এবার যদি রক্ষা পায় ত সে কেবলমাত্র লীলার অপরিসীম সেবা যত্নের গুণে ! আর জ্ঞান হলেই তাঁকে খুঁজছে, সেই জন্যেই ত তিনি দুদিন আসতে পারেন নি।

অভিজ্ঞতার মূল্য

এককোণ হইতে রামজনম বলিয়া উঠিলেন—আজ আস্‌বেন কি ?

মাটির খুরিতে আটা-সংযুক্ত ফলমূল জিলাপি বাতাসা মিশ্রিত প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইয়া তখন কোলাহল ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, এবং সকলেই তাহা অগ্রে সংগ্রহ করিবার মানসে অধিকতর তৎপর হইয়া পড়িতেছিল।



—

১৭

সকাল কাছারীর শনিবার। দ্বিপ্রহরে মক্কেলের প্রতীক্ষার বালাই নাই। গ্রীষ্মের আতিশয্যে ঘরের মধ্যে হাফরের মত উষ্ণ বাতাস, বাহিরে উত্তপ্ত লু'এর প্রকোপ! দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, অলস ঘর্ম্মাক্ত দেহ এলাইয়া, হাত পাখার সাহায্যে কোন ক্রমে একবার চক্ষু বুজিতে পারিলে ঘণ্টা কয়েক নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়া কোন গতিকে সেদিনকার মত অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়!

গৃহিণীর অভাবে অবিন্যস্ত গৃহ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কেতাব কাগজ, দোয়াত কলম, আসবার পত্রের মধ্যস্থলে একটা তক্তাপোষের ময়লা ফরাসের উপর শায়িত রামজনমের প্রগাঢ় সুপ্তি সেদিন অপরাহ্ণে ভঙ্গ হইল—সহৃদয় বন্ধুবর্গের অযাচিত শুভাগমনে!

মুরলীমনোহর সম্প্রতি 'ব্রীজ' খেলা শিখাইয়া মোক্তার সাহেবের মানসিক ক্লেশ অপনোদনের আয়াস পাইতেছিলেন এবং সঙ্গীরূপে ব্রিজবিহারী ও রামপদারথ কৃপাপরবশ হইয়া তাহাতে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অবশ্য অবকাশও ছিল পর্য্যাপ্ত—যেহেতু প্র্যাক্‌টিশের বাজার ইদানিং সকলেরই মন্দা যাইতেছিল।

যথারীতি তাসের বৈঠক বসিল বটে, কিন্তু আসর যেন আজ

কিছুতেই জমিল না। মোক্তার সাহেবের অন্যমনস্কতায় প্রায়ই খেলা ভুল হইয়া যাইতে লাগিল এবং সেজন্য ব্রিজবিহারী কয়েকবার মৃদু তিরস্কারও করিলেন।

রামপদারথ বিজেতার আনন্দে বলিলেন—ওঁর কি আজকাল মাথার ঠিক আছে যে এত খেয়াল রেখে খেলবেন? উনি যে রাজি হয়ে এতক্ষণ খেলে যাচ্ছেন, এই তোমাদের সৌভাগ্য!

ঠিক এই সময়ে এক প্রকাণ্ড ভুল করার জন্য রামজনমকে অনেকগুলা 'ডাউন' দিতে হওয়ায় ব্রিজবিহারী তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুরলীমনোহর বলিয়া উঠিলেন—আরে, এই 'রবার'টা শেষ করে যাও!

রাগিয়া ব্রিজ বলিলেন—'রবার'! বারোশো 'ডাউন' দিয়ে তারপর আবার 'রবার'! যাঃ, এমন খেলা না খেলাই ভাল।

মুরলী হাসিয়া বলিলেন—তোমায় বুঝি এই সাড়ে ছয়টার ট্রেণে বাড়ী যেতে হবে, তাই মোক্তার সাহেবের দোষ দিয়ে উঠে পড়লে?

বাহির হইয়া যাইবার সময় ব্রিজবিহারী বলিয়া গেলেন—যাবই ত, বাড়ী যাব না? আমার ত আর ওঁর মত হাল হয় নি!

রামপদারথ উঠিয়া জুতা পরিতে লাগিলেন—তবে আমিও আর বসে কি করবো। এই বেলা যাত্রা করা যাক্।

মুরলীর স্ত্রী গিয়াছিলেন ভাগলপুরে—পিত্রালয়ে। সুতরাং তাঁহার কোথাও যাইবার তাড়া ছিল না। তাহা ছাড়া তাঁহার

ফৌজদারী প্র্যাকটিসই ছিল ভাল, সেজন্য উকীল হইলেও মোক্তার সাহেবের সহিত বনিত অন্য সকলের চেয়ে বেশী।

ফরাসের উপর দেহটাকে ছড়াইয়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া মুরলীমনোহর বলিলেন—এ কিন্তু অন্যায় হচ্ছে মিসেস লালের। আপনার তক্‌লিফের কথাটা একবার ভেবে দেখা ত উচিত।

রামজনম একটি চাপা দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিলেন—আজ হয়ে গেল সাতদিন!

মুরলী হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন—আচ্ছা, দু'দিন থেকে কিশোরী বেশ ভালই আছে ত শুন্‌ছি? তবে আর কেন সেখানে পড়ে থাকা?

রামজনম হেঁট হইয়া মৃদু মৃদু দুলিতেছিলেন। একটু পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন—কে বল্‌তে যাবে ভাই? তা হলে এখনই একটা ঝগড়া বেধে যাবে। কি গল্‌তিই না করে ফেলেছি!

হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে মুরলী বলিতে লাগিলেন—তখনই আপনাকে বলেছিলাম! স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা কোন প্রকারেই দিতে নেই, ওদের বিশ্বাসই বা কি? একবার হাতের বাইরে চলে গেলে, আর নাগাল মেলা ভার। সব কাযেই এগিয়ে বসে থাক্‌বে। আরে, পর্দ্দা যে আমাদের দেশে প্রচলন করা হয়েছিল, সে অনেকে দেখে শুনে, বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করে। আপনারা গেলেন কিনা সেই পর্দ্দা তুলে দিয়ে, ওদের ঘরের বাহির করে, সব পুরুষদের চোখের সামনে ধরে, মিশতে দিতে! এতে আমাদের

কত রকমের অসুবিধা, ওদের কত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা, এখন মালুম হচ্ছে ত পদে পদে? বেশী দূর যেতে হবে না, চেয়ে দেখুন না বাঙ্গালা দেশে, এর ফল কী ভীষণ হয়েছে। আজকাল ক্রমে ক'লকাতায় এর ঢেউ বেশ এসেছে। সেখানে গিয়ে দেখ্‌বেন—মেয়েরা সব রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, অবাধে—হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যার সঙ্গে খুসী মিশ্‌ছেন, যেখানে যখন ইচ্ছা যাচ্ছেন, অভিভাবকদের আর সাধ্য নেই যে তাঁদের আটক করে রাখেন। শুধু কি তাই? যার সঙ্গে যিনি প্রেমে পড়বেন, তাতে কোন কথা কইবার জো নেই; যদি কিছু বলতে যান ত অচিরেই দেখ্‌তে পাবেন হয় তারা অদৃশ্য, আর না হয়ত তাদের দেহ কোন ট্যাঙ্কে অমর বন্ধনে একত্র হয়ে ভাস্‌ছে! কি শোচনীয়, কী বীভৎস পরিণাম ভেবে দেখুন ত?

মোক্তার সাহেব চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিলেন। হুতাশ্বাসের স্বরে বলিলেন—ঐ ক'লকাতারই মেয়ে ত এই লীলা! ওখান থেকেই শিক্ষিত হয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

মুরলী চৌকীর উপর একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—সেই ত হয়েছে আরও খারাপ! আজকাল লেখাপড়া শিখিয়ে আধুনিক নাটক নভেল পড়তে দিন্—আর সিনেমা থিয়েটার দেখিয়ে আনুন—ব্যস, আর কিছু করতে হবে না!

যুক্তিটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া রামজনম হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন।

মুরলী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন—উদারনীতির এমন শিক্ষালাভ হবে তাহলে যে, স্বাধীন প্রেমের বিচিত্র গতির সম্ভব অসম্ভব পর্য্যায়ের তারে তারে মন প্রাণ একেবারে বাঁধা হয়ে থাক্‌বে! তারপর সুযোগ সুবিধার পথ ত আপনারা খুলেই দিয়েছেন!

এইবার রামজনম ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিয়া দৃঢ়স্বরেই বলিলেন—আমি কিন্তু গোড়া থেকেই বাধা দিতে চেয়েছি, কতবার আপত্য করেছি, কিন্তু দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে আমরা কতদূর কি করতে পারি বল?

মুরলী বলিয়া উঠিলেন—বেশ ত, উপস্থিত আশ্রম উঠে গেছে, সমিতি ভেঙ্গেছে। নেতাদের পৃষ্ঠও আর দৃষ্ট হয় না। এইবার ধীরে ধীরে রাস টেনে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনুন! এ বিষয়ে আমি আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করবো কথা দিচ্ছি।

রামজনম যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—তুমি আর কি করবে তা'ত জানি না, আমিই পেরে উঠছি না! গোড়াতেই গলদ হয়ে গেলে—

বাধা দিয়া মুরলী চাপাস্বরে বলিলেন—গলদ শোধরাতে কতক্ষণ? আপনি এক কাজ করুন। চলুন আজই ডাক্তার লাহিড়ীর বাড়ী, আমি না হয় সঙ্গে যাচ্ছি। তাঁকে গিয়ে পরিষ্কার করে বলুন যে, কালই সকালে যদি মিসেস লাল ফিরে না আসেন —ত' এর একটা যথাযথ ব্যবস্থা আপনি পরশুই করবেন।

এ পরামর্শ কিন্তু রামজনমের মনঃপূত হইল না, কেন না তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—তুমি জান না হে লীলার প্রকৃতি !

মুরলী তখন উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—তবে যা ভাল বিবেচনা হয় করবেন। আপনার স্ত্রী, আপনি ভাল মন্দ বুঝবেন। কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখবেন, আর আল্‌গা দিলে আয়ত্তের মধ্যে আন্‌তে পার্ব্বেন না। রামজনম সজোরে বলিলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সে আর কিছুতেই ভুল হবে না আমার !

১৮

রাত্রে অত্যধিক গরম ও মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক উত্তেজনার জন্য পরদিন সকালে রামজনমের নিদ্রা ভাঙ্গিতে দেরী হইয়া গেল। স্নানাদি সারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন আটটার পর।

পথিমধ্যে অনেক কিছুই ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু কোন কল্পনা একটা স্থির পরিণতিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন প্রকার অসংলগ্ন চিন্তা মাথার মধ্যে আসিয়া তাহাকে পণ্ড করিয়া দিতে লাগিল।

একবার মনে হইল ষ্টেশন হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সোজা গিয়া লীলাকে যে কোন উপায়েই হউক লইয়া চলিয়া আসিবেন। কিন্তু সে খরচটা বাঁচিয়া যায় যদি ডাক্তার লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতে যাওয়া যায়। কিংবা যদি ডাক্তারকে ধরিয়া লীলার বিরুদ্ধে খুব কতকগুলা কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়া যায়—ত সে কি রকম হয়? ইহাপেক্ষা বোধ হয় মিষ্ট কথায় যদি নিজের অসুবিধা ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া ডাক্তারের মারফৎ ডাকিয়া পাঠান যায়—ত আর বিবাদের আশঙ্কা থাকে না এবং লীলাও হয়ত অবিলম্বে ফিরিয়া আসে।

এই সব চিন্তায় মগ্ন হইয়া রামজনম অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে কানের নিকট হর্ণের শব্দে তুই লাফে রাস্তার অপর পাশে

যাইতেই মোটরখানা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে উচ্চহাস্যের পর শোনা গেল—উঠে আসুন মোক্তার সাহেব, আর একটু হ'লেই হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হো'ত আর কি!

সোফারের পাশেই ডাক্তার লাহিড়ী—পিছনের সিটের দিকে হাত দেখাইয়া বলিলেন—আসুন, আসুন, আমার অনেক কায, দেরী কর্ব্বেন না।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতে ভিতরে এক পা তুলিয়াই রামজনম স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! এমন সময় গাড়ীখানা সশব্দে দুলিয়া উঠিতে তিনি কোনক্রমে টাল সামলাইয়া বসিয়া পড়িলেন—এক ধাক্কা দিয়া লীলাকে!

গাড়ী চলিতে লাগিল, রামজনম গোঁজ হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। লীলা তখন তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে কহিলেন—কী চেহারা হয়েছে বলত' এই ক দিনে, চোখে দেখা যায় না! কেন ফাগুনি কি মরেছে?

রামজনমের মুখে আসিয়াছিল—আমিই যে মরিনি এই আশ্চর্য্য! অভিমানের ভারে কিন্তু কথাগুলি চাপা পড়িয়া গুমরাইতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর উদ্দেশে লীলা এবার বলিলেন—চলুন দাদামশাই, সোজা একেবারে আমাদের' বাসায়—আর আমি কোথাও যা'ব না।

উত্তর আসিল—কিন্তু এও যে তোমাদেরই বাড়ী দিদি, আর বিশেষ করে আজ যে তোমরা আমার অতিথি।

ডাক্তার লাহিড়ীর বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল এবং তিনি দুইজনকেই হাত ধরিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় পাশাপাশি বসাইলেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন —দেখ, এমনটি না হলে মানায় ?

লীলা লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। রামজনম উঠিবার ভাণ করিয়া বলিলেন—আমার একটা জরুরী কন্‌সাল্‌টেশন আছে লালা হরেকিষণরামের সঙ্গে। এখনই তাঁর কাছে যেতে হবে।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার বলিলেন—লালাজি সস্ত্রীক সকালের একস্‌প্রেসে পাটনা চলে গেছেন, তাঁর ভাইএর অসুখের তার পেয়ে। ভোরে এসেছিলেন আমার কাছে।

রামজনম কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না—লীলা বলিয়া উঠিলেন—আপনি কি আবার বেরোবেন নাকি দাদামশাই ?

ডাক্তার বলিলেন—নিশ্চয়ই, এখনও আমায় তিন চার জায়গায় যেতে হবে। আগে দেখি তোমাদের কষ্ট দেবার ব্যবস্থা কতদূর কি হোল, ভেতরে গিয়ে। ততক্ষণ—অনেকদিন পরে দেখা, তোমরা একটু বিশ্রম্ভালাপ কর না কেন !

ডাক্তার অন্দরে চলিয়া গেলে লীলাবতী রামজনমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি অমন করে রয়েছো কেন, রাগ হয়েছে বুঝি ?

উত্তরের অপেক্ষা একটু করিয়া, তাঁহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া লীলা মিষ্টস্বরে বলিলেন—খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি এই ক'দিন ছেড়ে থাক্‌তে? কি কর্ব্ব বল, আমিও কি ছাই সুখে ছিলাম! গিয়ে এমন মুস্কিলে পড়ে গেলাম, না পারি থাক্‌তে, অথচ সাবিত্রী আর কিছুতেই আস্‌তে দিলেন না। একদিন দাদামশাইএর সঙ্গে চুপি চুপি চলে আসছিলাম, জানতে পেরে সাবিত্রী পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন—দিদি, তুমি চলে গেলে ওঁকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না! অগত্যা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমায় এতদিন থাকতে হয়েছিল। তাও যদি তুমি নিজে এক-আধবার যেতে, ত এত কষ্ট হত না। অন্ততঃ ফাগুনিকে দিয়ে আমায় আনতে পাঠালে না কেন? আমি আস্‌বার আভাস জানাতে গেলেই কিশোরীবাবুর মা তাই বল্‌তেন— তোমার যাবার তাগাদা ত কই আসে নি লীলা, এদিকে আমার ছেলে যে এখন তখন হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক কেউ আর মনে করেনি যে অমূল্য প্রাণটি ফিরে পাওয়া যাবে! একমাত্র ছেলে, বাপ মার সে কাতরতা, সাবিত্রীর বিহ্বলতা যদি দেখতে, তোমার চোখেও জল আসতো।

রামজনম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—আমিও ত বাপের এক ছেলে, কিন্তু আমার প্রাণ অত অমূল্য নয় বোধ হয়?

লীলা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—ও মা, শোন কথা

একবার! তোমার প্রাণের তুলনায় আমার কাছে অন্য কোন প্রাণ? তুমি কি ক্ষেপে গেছ না কি?

রামজনম সেইভাবেই উত্তর দিলেন—কি জানি কে ক্ষেপেছে। এই এতদিনে একবারও খোঁজ নিয়েছ আমার?

লীলা বলিয়া উঠিলেন—রোজ, রোজ। দাদামশাই গেলেই দুটি বেলা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে আমার অন্য কায। বিশ্বাস না হয়—

পর্দ্দা সরাইয়া ডাক্তার ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই বলিলেন—সাক্ষী হাজির হ্যায়, তাকে জেরা করে, জবানবন্দী নিয়ে, দেখ্‌তে পারেন মোক্তার সাহেব।

লাহিড়ীর কথা ও দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে রামজনমের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি তাহা চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অগ্রসর হইয়া ডাক্তার তখন বলিলেন—কি? সাক্ষীর বহর দেখে মোক্তার সাহেব ঘাবড়ে গেলেন না কি?

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কি যে আপনার কথা দাদামশাই! উনি কি কখনও আমায় অবিশ্বাস করেন?

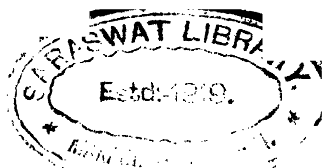
ডাক্তার লীলার নিকটে গিয়া বলিলেন—সেই ভাল। কিন্তু তোমার মানভঞ্জনের পালা শেষ হল লীলা?

অপ্রতিভভাবে লীলা রামজনমের মুখের দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার বলিলেন—কি? জবাব নেই যে? ওদিকে আমার সব তৈরি।

রামজনম এবার বলিলেন—কিন্তু এতক্ষণ ফাগুনি বোধ হয় আমাদের রসুই সেরে ফেলেছে।

ডাক্তার উত্তর দিলেন—না, সে পথও বন্ধ। তাকে মানা করে পাঠিয়েছি—অনেকক্ষণ। এখন দশটা বাজলো। তাহার পর লীলার নিকট সরিয়া গিয়া চোখের ইঙ্গিত করিয়া চাপাস্বরে বলিলেন—এখনও বেশ গোল মেটেনি দেখ্‌ছি—একটু বেসুরো বাজ্‌ছে। তাহলে ওদিকে যাই, খাবার দিতে বলি,, তুমি এদিকে ততক্ষণ—বুঝেছ কি না—সেই সুযোগে,—"দেহি পদবল্লভমুদারম্" —গেয়ে ফেল!



১৯

মৌজা রহুয়া ও রোসনার মধ্য দিয়া নদীটি পশ্চিমদিক হইতে সোজা টানা পথ ধরিয়া আসিতে সেইখানে সহসা বাঁক লইয়া একেবারে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া গিয়াছে।

চৈত্রের শেষে ক্ষীণতোয়া এই স্বচ্ছ-সলিলার বাঁকের ধারে সন্ধ্যামুখে বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। এখান হইতে প্রায় এক রশি দূরে তাহাদের বাড়ী এবং এই সমস্ত চরটা তাহার পিতার জমিদারীভুক্ত! কিছুদিন হইতে প্রত্যহ এই সময় নিরালায় এইখানে ঘুরিয়া বেড়ান তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

একটা বড় পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া, বেলা নদীর দিকে চাহিয়া বায়ুভরে ছোটখাট তরঙ্গগুলির খেলা দেখিতে দেখিতে অতীত স্মৃতির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। পর্দ্দা অন্দোলনের কার্য্যে ব্রতী হইয়া যে-দিন সে পিতার নিকট হইতে অতিকষ্টে অনুমতি পাইয়া উৎফুল্লচিত্তে যাত্রা করিয়াছিল সে-দিন সে একবারও মনে করিতে পারে নাই যে এত সত্বর তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে দারুণ গ্লানি ও মর্ম্মদাহ বহন করিয়া! মিসেস্ লালের সেই অহেতুক মন্তব্য ও তাহার চেয়েও কঠিন বাক্য আজও তাহার কানের মধ্যে যেন ধ্বনিত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া ফেলে

বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও তৃপ্তির সহিত অনুভূত হয় যে, সে দিনের সেই সংঘর্ষের আলোই চোখ ফুটাইয়া তাহার জীবনের গতিকে নিমেষে ভুল পথ হইতে এই নদীর বাঁকের মতই যেন ফিরাইয়া দিয়াছে !

একটা কোনও অবলম্বন চাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরতার সহিত জীবনতরী বাহিয়া যাইতে পারে। আশ্রম তাহাকে প্রথম হইতেই আনন্দ দিত সন্দেহ নাই এবং বাহিরের লোকের সংস্পর্শ ক্রমেই অকারণ লজ্জার জড়তা অপসারিত করিয়া অবাধ লঘু স্বচ্ছন্দতার আস্বাদ দান করিতেছিল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, ইহার চেয়ে কত গভীর উপভোগ্য আনন্দ নারী-জীবনে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। সেই আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়াছে তাহার বিকচোন্মুখ নারীহৃদয়ের শিরা উপশিরায়···কে ? ··কাহার অস্ফুট আহ্বানের অব্যক্ত আকর্ষণী শক্তি লীলাবতীর অন্যায় রোষকে হেলায় দলিত করিয়া তাহাকে অবলীলাক্রমে ঈপ্সিতের সহিত মিলনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে ?

তাই বুঝি এতদিনে তাহার সন্ধানের আভাস মিলিয়াছে, নারীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, পরম সার্থকতা, নিহিত আছে—কোথায় ?

নৌকার দাঁড়টা সন্তর্পণে এক পাশে তুলিয়া রাখিয়া জয়করণ নিঃশব্দে তীরে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর মৃদু পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া কিছুদূর আসিতেই বেলার সহিত তাহার দৃষ্টি-

বিনিময় হইয়া গেল। দিগন্তে অন্তিম সূর্য্যের রক্তাভার মতই নিমেষে বেলার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

দুই হাতে তাহার লজ্জানত মুখটি তুলিয়া ধরিয়া জয়করণ বলিল —এখানে ব'সে কি ভাবছ বেলা?

বেলা কিছুই বলিল না। বলিবার চেষ্টাও তাহার দেখা গেল না। তেমনি ভাবেই মাথা নামাইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া যেন কিসের আবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া জয়করণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এক হাত তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—আমার ওপর রাগ হয়েছে নাকি?

এইবার বেলা সোজা হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—হাঁ রাগ ত করেছিই—কারণ থাকলেই রাগ হয়! তাড়াতাড়ি পাশেই বসিয়া পড়িয়া জয়করণ বলিতে লাগিল—এতদিন কেন যে আসতে পারিনি, কত কষ্টে—কি করে যে আজ পালিয়ে এসেছি তা যদি তুমি শুনতে—

বেলা একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি শুনতে কিছুই চাই না। অন্ধকার হয়ে আসছে, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এবার আমি বাড়ী যাব।

জয়করণ তাহার দুটি হাত ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিল—আর একটু ব'স বেলা, অনেক কথা আছে। আমার

নৌকায় বাতি আছে, আমি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।

সজোরে মাথা নাড়িয়া বেলা বলিয়া উঠিল—না, না, আর আমি এখানে থাকতে পারবো না। আর কেনই বা থাক্‌বো ?

বেলাকে এক রকম জোর করিয়া বসাইয়া জয়করণ কাতর কণ্ঠে বলিল—আর দশটি দিন মাত্র সবুর ক'রো বেলা। তারপর আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাক্‌বে না, কোন সঙ্কোচের গ্লানি আমাদের অন্তরায় হতে পারবে না—এক সঙ্গে দেখলে কেউ কিছু বলতে সুযোগ পাবে না। তখন আমরা দুজনে মিলে, মনের আনন্দে প্রাণভরে—

বেলা বলিয়া উঠিল—তোমার বাবা রাজি হলে ত !

জয়করণ তখন বেলার আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল—রাজি তাঁকে হতেই হবে ! না হয়ে আর অন্য উপায় নেই, এমন মজার চাল চেলেছি এক !

উৎসুককণ্ঠে বেলা বলিল—কি বল ত ?

অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে নিজের কাহিনীকে অলঙ্কার-ভূষিত করিয়া জয়করণ যতই বিবৃত করিতে লাগিল, প্রশংসার দীপ্তিতে বেলার চক্ষু ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং চতুর্দ্দিকে অন্ধকার যে ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল বেলার আর সেদিকে খেয়ালই ছিল না। অজানিত পুলকে বিভোর হইয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন এক অপরূপ উন্মাদনায় কাণায়

কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে কতক্ষণ যে কি ভাবে কাটিয়াছিল বেলা তাহা জানিতে পারে নাই। এমন সময় অদূরে পরিচিত কণ্ঠস্বরের আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিল —বেলা!

অপ্রতিভ হইয়া বেলা শিলাখণ্ডের উপর হইতে নামিয়া পড়িল —এ যে ললিতা! কখন এল?

জয়করণ ক্ষিপ্র হস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—চল আমরা নৌকায় পালিয়ে যাই, তাহলে আর—

তীব্র টর্চ্চের আলো তাহাদের উপর পড়িতেই জয়করণ বসিয়া পড়িয়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণ পরেই ললিতা কাছে আসিয়া বলিল—এখানে, একলা, এই আঁধারে, কি কচ্ছিস ভাই?

তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি, চোখে কৌতুকের দৃষ্টি!

নদীর দিক হইতে ঝপাঝপ্ শব্দ আসিতে লাগিল!

ললিতা বিস্মিতভাবে বলিল—নৌকা নাকি ভাই?

বেলা এতক্ষণ নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার সহসা ফিরিয়া স্বচ্ছন্দেই বলিল—হাঁ, তা আর বুঝতে পার্‌লি না? জয়করণ বাবু! তোকে দেখেই পালিয়ে গেলেন।

ললিতা তখন গলা ছাড়িয়া খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল —ডাকব নাকি? তাহার পিঠে গুম্ গুম্ করয়া গোটা কতক কিল বসাইয়া দিয়া বেলা বলিল—তুই এলি কখন পোড়ারমুখী!

২০

ললিতার শ্বশুরালয় রহুয়ায় ও জয়করণের টোলাতেই। প্রায় এক বছর পরে আজ সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রিয় সখী বেলার সহিত দেখা করিতে আসিয়া শুনিল, সে নদীর ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, এখনও ফিরে নাই। সে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল।

দীর্ঘকালের পর তুই বন্ধুতে সাক্ষাতের ফলে কিল খাইয়া তাহা হাসিমুখে সহ্য করিয়া ললিতা বলিল—তোর কি পরিবর্ত্তনই না হয়েছে ভাই, এই অল্প সময়ের মধ্যে!

বেলা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল—কিসে?

সেই শিলার উপর বসিয়া পড়িয়া ললিতা বলিতে লাগিল—এই নির্জ্জন অন্ধকারে, নদীর ধারে, তুই কখনও এ সময় একলা থাক্‌তে পারতিস্?

ললিতার গালে একটি মৃদু চাপড় দিয়া বেলা বলিল—এখনও একলা নই, এর আগেও ছিলাম না।

তবুও তোর খুব সাহস বেড়েছে—বলিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ললিতা চাপাস্বরে কহিল—জয়করণবাবুর সঙ্গে এত ভাব তোর কি রকম করে হোল রে?

অভিজ্ঞতার মূল্য

পূর্ব্বাকাশে তখন কৃষ্ণা-তৃতীয়ার চাঁদ হাসিয়া উঁকি মারিতেছে দেখিয়া, অন্ধকার গোপনে অন্তর্হিত হইতেছিল। কখনও সেই নির্ম্মল উজ্জ্বল শশীর পানে চাহিয়া, কখনও উচ্ছ্বল খরস্রোতা নদীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বেলা সেই শিলাখণ্ডের উপর ললিতার দেহে ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাহার প্রেমের অরুণ উন্মেষ ও অভিনব বিকাশের কাহিনী আবেগ-ভরা স্বরে একে একে সমস্তই কহিতে লাগিল। প্রিয়তমা সখীর নিকট এতদিনে মনের গোপন কথাগুলি নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়া অব্যক্ত পরম তৃপ্তিতে অবশেষে বেলা তাহার দেহ এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুজিল।

ললিতা নিবিষ্টচিত্তে প্রতি কথা প্রতি ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—ঈস্। তুই যে একেবারে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিস দেখছি। এরই মধ্যে এত শিখ্‌লি কোথা থেকে?

বেলা রাগ করিল না। তাহার আয়ত চক্ষু ঈষৎ চাহিল, ঠোঁটের কোণে মিষ্ট হাসির একটি রেখা ফুটিল। তারপর ধীর স্বরে বলিল—সত্য ভাই, আমিই বলতে পারি নে, কেমন ভাবে কি করে আমি এত ভালবাস্‌তে জানলাম; কি মনে হয় জানিস? আমার মত প্রেমের এত গভীরতা বোধ হয় কেউ কখনও অনুভব করে নি।

বেলার দুই গণ্ডে অঙ্গুলীর মৃদু চাপ দিয়া ললিতা বলিয়া উঠিল—তুই চুপ কর তো! তোর বাড়াবাড়ি দেখে আর বাঁচি নে।

আমরা যেন আর প্রেমের স্বাদ পাই নি! আসল ভালবাসা পাওয়া যে কি, তার সন্ধান পাওয়াও যে কত দুর্লভ, সে যে পেয়েছে সেই কেবল জানে।

ললিতার মুখ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বেলা সন্দিগ্ধ হইয়া কহিল—তোর এমন কথা বল্‌বার মানে?

ললিতা একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—মানে মতলব আর কি—জান্‌তে পারবি দিন কতক পরেই।

একটা সন্দেহের ছায়া যেন ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহাকে এক মুহূর্ত্তও সহ্য করা বেলার পক্ষে যে কি কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইল।

তোর পায়ে পড়ি ভাই, বলনা শীগ্‌গির কি হয়েছে?

ললিতা একবার দ্বিধা করিয়াই বলিয়া ফেলিল—তোর কি মনে হয় জয়করণ বাবু সত্যই তোকে খুব ভালবাসেন?

বেলা উঠিয়া বসিতেই এক ঝলক জোছনা তাহার দীপ্ত মুখের উপর পড়িয়া তমসামুক্ত অনাবিল প্রেমের আলোকে তাহা উদ্ভাসিত করিয়া দিল।

নিরুদ্বেগ স্বচ্ছন্দ স্বরে সে বলিল—এই-ই? আমার কি ভয়ই না হয়েছিল! তা ভাই তুই নিজের চোখে না দেখলে ত বুঝতে পারবি নে। তুই যদি চুপি চুপি আস্‌তিস্—আলো না ফেলে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবই শুনতে পারতিস—

ললিতা কিন্তু মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল—না শুনেছি, সে জন্য

দুঃখ নেই। তোমায় কিন্তু ভাই একটু সাবধান না করে থাকৃতে পারছি না, কিছু মনে কোরো না। পুরুষ মানুষদের কথায় অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই, তাতে হয়ত বিপদে পড়তে হয়।

বেলা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—উনি সে প্রকৃতির মানুষ নন্। তুই যদি একটিবার দেখ্তিস ওঁর সরলতা—আন্তরিকতা, তা হলে ওসব কথা তোর মনেই আস্তো না।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—পুরুষদের আকৃতি বা প্রকৃতির কথা কিছু না বলাই দুর্ব্বলা আমাদের পক্ষে হয় ত ভাল, হয় ত অনধিকার চর্চ্চা। আমাদের একবার বাইরে বেরোলেই দোষ, দুটো দূর আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে হেসে কথা কইলেই অপরাধ। অথচ ওঁরা যদি—থাক্ সে সব কথা। কেন না ওঁদের বেলায় লীলা খেলা, আর পাপ লিখেছেন মোদের বেলা। কিছু দেখলেও প্রাণের ভয়ে চোখ বুজে থাকৃতে হয়। কৌতূহলী হইয়া বেলা বলিল—কেন, কিছু দেখেছিস্ নাকি?

ললিতা সে কথার উত্তর না দিয়া বেলার চিবুক স্পর্শ করিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল—কিন্তু তুই ভাই সত্যই ভালবেসেছিস, গুণ আছে তোর প্রেমের—কি সুন্দর রূপ হয়েছে তোর এই কয় মাসে!

ললিতার হাত ধরিয়া বেলা বলিল—যাঃ বাজে কথা। তুই বুঝি কথা এড়িয়ে যাবি? এখন, কি দেখেছিস—বল্।

ললিতা একটু ভাবিয়া বলিল—দেখি নি ত কিছুই।

বেলা তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল—তবে রে মিথ্যেবাদী !

ললিতা বলিয়া ফেলিল—না দেখলেও—কানে কিছু কিছু কথা আসে বটে।

তবে বল্, কি শুনেছিস্।

ললিতা বলিতে লাগিল—জয়করণবাবু তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে যে সব কথা বলেন, ইনিও তাঁদের কাছে সব শুনতে পান কিনা, তাই অনেক কথাই আমার শোনা হয়ে যায়। কেমন করে তোমাদের এত ভাব হোল, তারপর ছল করে লীলাবতীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে আগে থাক্‌তে সব ব্যবস্থা করে, নিশীথ রাতের ট্রেনে কি ভাবে তোমায় নিয়ে এসেছিলেন—নিজের কামরাতে সযত্নে তোমার বিছানা করে দিয়েছিলেন—আর কেউ না কি ছিল না—আরও কত কি !

উত্তরোত্তর লজ্জিত হইয়া বেলা বলিল—ঐ ত ওঁর দোষ। এত সরল আর খোলা প্রাণ, কোনও কথা চাপতে বা লুকোতে জানেন না। অথচ এত ভালমানুষ যে, সে সব কথা বলে কেলার পরিণাম কি হবে, তাও চিন্তা করে দেখেন না।

ললিতা আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—কিন্তু পুরুষের অত অপরিণামদর্শী হওয়া যে আমাদের পক্ষে অনর্থের সূত্রপাত করে, সেটাও দয়া করে একবার ভেবে দেখা উচিত।

বেলা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—এতে আর কি এমন অনর্থ হতে পারে ভাই ?

এবার কতকটা বিদ্রূপের স্বরে ললিতা বলিল—না, এমন আর কি বল। তবে কাল আমি এতদূর পর্য্যন্ত শুনে এসেছি যে এমন অবস্থা তোমার নাকি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তোমার বাবাকে এখন বাধ্য হয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলতে হবে—এবং সেই চার হাজার তিলক দিয়ে।

বেলা দৃপ্তস্বরে উত্তর করিল—হতেই পারে না—মিছে কথা। এই খানিক আগে আমায় বলে গেলেন যে এমন চাল এক চেলেছেন যে তাঁর বাবাকে রাজি হতেই হবে, বিয়ে দিতে, টাকা যা হয় দিলেই হবে।

আজ সকালের কি খবর জান? যা শুনে, কেবল তোমাকে বলবার জন্যই আজ আমি এখানে ছুটে এসেছি—বলিয়া ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই আবার বলিল—না. এখানে সে কথা বলব না। আগে বাড়ী চল।

বেলাও উঠিয়া পড়িয়া ললিতার হাত চাপিয়া ধরিল—না, না, তোকে এখনই বল্‌তে হবে—মেরি কসম্।

ললিতা তখন কহিল—তবে আমায় বল্‌তেই হল, যেন দুঃখ পাস্‌নে ভাই। ধামনের জমিদার, বাবু তেজনারায়ণ তেওয়ারীর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে জয়করণ বাবুর সম্বন্ধর কথাবার্ত্তা কিছুদিন ধরে চল্‌ছে। তিলক দেবেন নগদ পাঁচ হাজার, তাছাড়া বরাভরণ ইত্যাদিতে সবশুদ্ধ নাকি আরও চার পাঁচ হাজার খরচ কর্ব্বেন। তাঁরা আজ সকালে রহুয়ায় এসে পাকা কথা কয়ে সগুণ দিয়ে

গেছেন। তখন জয়করণ বাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সংবাদ পেয়েই—ওকি তুই অমন হয়ে পড়লি কেন ?

নিমেষের মধ্যে বেলার মুখ ছাইএর মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল এবং মুষ্টিবদ্ধ হাতে সে ধীরে ধীরে শিলার উপর বসিয়া ক্রমে শুইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বেলার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ললিতা বলিল—এই জন্যই ত এতক্ষণ বল্‌তে চাই নি। চোখ চাও বহিন্।

অনেক ডাকাডাকির পর বেলা চক্ষু চাহিল বটে, কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল যেন কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নাই, জলে স্থলে জমাট গাঢ় অন্ধকার ভরিয়া গিয়াছে !

২১

প্রায় একমাস পরে একদিন সকালে ডাক্তার লাহিড়ীর বাসায় গিয়া রামজনম ও মুরলীমনোহর ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বসিতে বলিয়া ভৃত্য জানাইল যে ডাক্তারসাহেব কলে বাহির হইয়াছেন, ফিরিতে বোধ হয় বিলম্ব নাই।

মুরলী বলিল—তখনই বলেছিলাম এখন দেখা পাওয়া যাবে না। পরে আসা যাবে, এখন চলুন—ভাল করে মুসাবিদা করে ফেলা যাক্।

রামজনম চিন্তিতভাবে বলিলেন—তা'র আগে এটাও দেখা দরকার যে—

—কি দেখবেন মোক্তার সাহেব? এই যে মনোহরও আছেন। —বলিয়া ডাক্তার প্রবেশ করিলেন।

মুরলী আরম্ভ করিল—আপনার সঙ্গে—

ডাক্তার কহিলেন—বসুন, বসুন—বড় বিমর্ষ দেখ্‌ছি যে মোক্তার সাহেব।

মুরলী বলিতে লাগিল—তাই ত পরামর্শের জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমার প্রথম প্রশ্ন হবে, কিশোরীলালকে আপনি শেষ কবে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শারীরিক বা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাকে আপনি কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তনে

যাবার উপদেশ দিয়েছেন কি না এবং যদি দিয়ে থাকেন ত সে কোথায় ?

তাহার চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন—তার আগে আমার এই প্রশ্ন হচ্ছে যে, পুলিশের সি আই ডিতে তুমি নাম দিয়েছ কি না এবং তাহা যদি হয়—ত সে কোন তারিখে।

রামজনম বলিয়া উঠিলেন—আমার বিপদের কথা বোধ হয় আপনার মালুম নেই ? চিড়িয়া উড়েছে !

ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—না, কোন্ চিড়িয়া ভাই, ময়না—না তোতা ?

মুরলী বলিতে লাগিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্যাম্প রয়েছে আজ পাঁচদিন, চাম্‌থায়। মোক্তার সাহেব ও আমি সেখানে একটা কেসে ছিলাম চারদিন। আজ ভোরের ট্রেণে ফিরে এসে দেখা গেল মিসেস্ লাল অদৃশ্য হয়েছেন ! অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি কিশোরীর সঙ্গে কার্সিয়ং গেছেন ! এই রকম একটা ঘটনার আশঙ্কা আমাদের অনেক দিন থেকেই ছিল। স্বামীর বিনানুমতিতে একজন পরপুরুষের সঙ্গে—যা'র সহিত পূর্ব্বঘনিষ্ঠতার অনেক প্রমাণ আছে—গোপনে পলায়ন—এ এক রকম অসহ্য !

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন—তাই ত ! বিশেষতঃ পুরুষ যখন স্বাস্থ্যলাভ করতে চলেছেন। এখন মোক্তার সাহেব কি করতে চান ?

রামজনম বলিলেন—দেওয়ানী করে কে একবছর বসে থাকবে।

আমি আজই ফৌজদারী করে এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। ওয়ারেণ্ট বার করা আমার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।

ডাক্তার বলিলেন—সেই সঙ্গে স্ত্রৈচারের ব্যবস্থাও করবেন। তা আমাকে কি সাক্ষী মানতে চান না কি?

মুরলী বলিয়া উঠিল—অন্তত এখন জানতে চাই যে, আপনার পরামর্শেই কিশোরী কার্সিয়ং গিয়েছে কি না।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—আর যদি মিসেস্ লালের পরামর্শেই গিয়ে থাকে?

মুরলী বলিল—তা আমাদের কেস্ হবে না। বুঝতে পার্চ্ছেন না, বিবাহিতা স্ত্রী—abduction—আইন মানিয়ে ত চলতে হবে! কিশোরীই যে মিসেস লালকে অনেক দিন থেকে প্রলোভন দেখিয়ে, শেষে ভুলিয়ে নিয়ে গেছেন—

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—কি উদ্দেশ্যে?

মুরলী বলিল—সে সব আমরা ঠিক করে নেব। কিশোরীর বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা কেমন এবং আপনি তাকে কার্সিয়ংএ বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়েছেন কিনা—উপস্থিত এই দুটি কথা জানা আমাদের দরকার।

ডাক্তার বলিলেন—প্রথমে আমার জানা দরকার যে লীলা যদি কিশোরীর সঙ্গে কার্সিয়ং গিয়ে থাকেন, তাতে মোক্তার সাহেবের ভয় পাবার কি আছে?

মুরলী বলিল—ভয়ের কারণ নেই? কি যে বলেন!

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—আমার মনে হয়, ভয়ের ভিত্তি ওঁর নিজেরই দুর্ব্বলতায়—হতে পারে স্নায়বিক। কারণ, সাহেবের ক্যাম্পে বড় মকদ্দমায় হয়ত কয়দিন অত্যধিক পরিশ্রম হয়ে থাকতে পারে, তা না হলে এ রকম ঘটনাকে বিপদের মধ্যে গণ্যই করা যেতে পারে না।···কি বলেন মোক্তার সাহেব? মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যে দিন কিশোরী ও আপনার সঙ্গে এই পর্দ্দা নিয়ে আমার প্রথম আলোচনা হয়েছিল?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মোক্তার বলিলেন—মনে পড়ে বই কি। এ রকম বিপদে পড়তে হবে তখন কি জানতাম! আর প্রকৃতপক্ষে আমি কোনও কালে পর্দ্দার বিরুদ্ধে যেতে চাই নি—

ডাক্তার বলিলেন—কারণ মনের সে প্রসার গতি এখনও আপনার হয় নি।

রামজনম বলিয়া ফেলিলেন—নাই হোক। কিন্তু লীলাকে শাস্তি দেওয়া একবার দরকার হয়েছে। আপনার কাছে সে জন্য আমি করজোড়ে সাহায্য প্রার্থনা কর্চ্ছি।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করিয়া বলিলেন—আমিও করজোড়ে আপনাকে অনুনয় করছি, এ বিষয়ে সাহায্য করতে আমায় অনুরোধ কর্ব্বেন না।

মুরলী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমরা ছেলেছোকরা মানুষ, এসব কথা ঠিক বুঝতে পারবে না।

তারপর রামজনমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—শুনছেন মোক্তার সাহেব। লীলার সঙ্গে যদিও কয়েক বিষয়ে আমার মতের মিল না থাকতে পারে, কিন্তু লীলার মত গুণবতী মেয়ে আমি কমই দেখেছি—বোধ হয় ঠিক্ অমনটি আর দেখি নি! কিছুদিন সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছি যে তার সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার তুলনা পাওয়া শক্ত। আপনি যে তার উদারতাকে এখনও সন্দেহ করেন, এতে আমি কেবল আশ্চর্য্য নয়, মর্ম্মাহত হয়েছি। তার কার্য্যে বা চরিত্রে সন্দিহান হওয়া আমি পাপ মনে করি। সুতরাং মাপ কর্ব্বেন, তাকে অপমান কর্ব্বার কোন চক্রান্তে আমার কাছে লেশমাত্র সাহায্য পাবেন না।

মুরলী উঠিয়া দাঁড়াইল—তা হলে চলুন। রামজনম ইতস্তত করিতেছেন, দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—একটি কথা জান্‌তে পারি কি? লীলাকে কি আপনি ত্যাগ কর্ব্বেন?

রামজনম বিস্মিত হইলেন—তার কি মানে আছে!

ডাক্তার কহিলেন—মানে আছে বই কি। এই সব মামলা হাঙ্গামার পর, আমার মনে হয়, লীলার মত আত্মসম্মানী মেয়ে—তার পিতার অবস্থাও মন্দ নয়—হয় ত আর আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইবে না।

মুরলী কিছু বলিতে উদ্যত হইলে ডাক্তার সঙ্কেতে তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—এইটেই হচ্ছে কিছু করতে যাওয়ার আগে—আপনার প্রধান বিবেচনার বিষয়। ভেবে

দেখবেন মোক্তার সাহেব—মকদ্দমার ফলাফলের উপর এটা মোটেই নির্ভর করছে না। একবার যদি প্রকাশ্য আদালতে এই সব কথা বার করেন, তারপর হয়ত অভিমানিনী লীলাকে ফিরে পাওয়া আপনার অসম্ভব হবে। আর আপনার কেসের কি গতি হবে তাও অনুমান করা শক্ত নয়। পর্দ্দার বিরুদ্ধাচারী আপনি ও আপনার স্ত্রী এবং কিশোরীলালও,—তার বহুল প্রমাণ আছে। সেই সূত্রে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা হতে দেবার সহায়তা আপনি যথেষ্ট করেছেন। সুতরাং রুগ্ন দুর্ব্বল কিশোরীকে দোষী প্রমাণ করা আপনার পক্ষে কতদূর সম্ভব, আইনজ্ঞ আপনারা বিচার করে দেখবেন। আমার বিবেচনায় লীলাকে অযথা সাজা দিতে গিয়ে, তার দশগুণ শাস্তি আপনি নিজেই পাবেন।

মুরলী বলিল—অনেক দেরী হয়ে গেল—আমার অন্য কাম আছে—এখন উঠুন।

রামজনম অব্যবস্থিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় ফাগুনি ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইয়া বলিল—মাইজি আ গেঁয়ে, আপকো বোলাতে হেঁ।

ডাক্তার আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন—কেস্ আপনাদের ফেঁসে গেল না কি? যা রে ফাগুনি, আমার গাড়ী নিয়ে জলদি তাঁকে এখানে নিয়ে আয়। না, না, দাঁড়া, আমি নিজেই গিয়ে দিদিকে আন্‌ছি।···চলুন না মোক্তার সাহেব, বাড়ী ত যেতেই হবে —আমার গাড়ীতেই চলুন—বিলম্বেন অলম্।

তারপর মুরলীর হাত ধরিয়া ডাক্তার বলিলেন—তুমিও এস, কিন্তু খুব সাবধান—এ সব কথা যেন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়।

গাড়ীতে উঠিবার সময় লাহিড়ী একবিন্দু আনন্দাশ্রু অলক্ষে মুছিয়া ফেলিলেন!

২২

কার্সিয়ংএ লীলাবতীর পিতার বাড়ী দুইখানি ছিল ; একটিতে নিজে থাকিতেন, অপরটি ভাড়া দেওয়া হইত। ডাক্তার লাহিড়ীর পরামর্শে ও লীলাবতীর সাহায্যে সেই বাড়ীটি ঠিক করিয়া কিশোরীর পিতা সপরিবারে কয়েক মাস কার্সিয়ংএ থাকা স্থির করিয়াছিলেন।

অপরিচিত স্থানে দুর্ব্বল স্বামীকে লইয়া গিয়া কোনও অসুবিধা বা বিপদে না পড়িতে হয়, এইজন্য সাবিত্রী পত্রযোগে লীলাবতীকে সঙ্গে যাইবার জন্য কাতর অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অনেককাল পরে পিতার সহিত সাক্ষাতের প্রলোভনবশে লীলা মনে মনে সম্মত ও কতকটা প্রস্তুত হইয়া ষ্টেশনে যান এবং সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ের ফলে তাহাদের সহিত যাওয়া সংঘটন হয়। অবশ্য তাহার পূর্ব্বদিন রামজনম সফরে যাওয়ার জন্য এ সকল বিষয় জানিতে পারেন না। সেই কারণে স্বামীর বিরক্তির ভয়ে লীলা সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই যত সত্বর সম্ভব ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তথাপি ইতিমধ্যে যে কিছু একটা গোলযোগ হইয়াছে তাহা ফাগুনি পরিষ্কার করিয়া না বলিতে পারিলেও লীলার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

তাহার পর রামজনমের সঙ্গে ডাক্তার লাহিড়ী আসিয়া যে কয়েকটি প্রশ্নে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বিবাদের পথ বন্ধ

করিয়া গিয়াছিলেন তাহাও লীলা আন্দাজ করিয়াছিলেন। ইহার পর রামজনম কিছুই বলেন নাই এবং লীলারও সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে স্পৃহা হয় নাই। কালের গতি সে ক্ষতের উপর প্রলেপ দিয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারে নিরাময় করিতে পারে নাই।

সেদিন বৈকালের দিকে লীলাবতী ভিতরের দালানে বসিয়া নিজ মনে চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন, এমন সময় তাহার পশ্চাতে আসিয়া বেলা ডাকিল—লীলাদি!

হাতের কায বন্ধ করিয়া লীলা কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। বেলা তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—লীলাদি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন কি?

কিসের অপরাধ, বেলা?

আমি রাগের মাথায় কি সব আপনাকে বলে চলে গিয়াছিলাম—

—ওঃ, এই-ই? কিন্তু তার আগে আমিও তোমায় শক্ত কথা কম বলি নি! তখন যদি জানতাম জয়করণ বাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—

—না হবে না—

—কেন এই যে শুনি তোমাদের এত ভালবাসা—

—না, ভুল শুনেছেন। ভালবাসতে বোধ হয় তিনি জানেন না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন—আমারই অন্যায় হয়েছিল,

অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে যাওয়া এবং সেই সুযোগ পেয়ে ছলনা করে তিনি যে আমার কি সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সে কথা পরে একদিন বলবো। কিন্তু ভগবানের দয়ায় সে চাতুরী ধরা পড়ে যায় এবং তার পরও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করায় আমি ঘৃণাভরে তার লাঞ্ছনার বাকি রাখি নি। যাক্ সে সব কথা। এখন আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন কিনা বলুন।

লীলা সস্নেহে বেলার হাত ধরিয়া বলিলেন—আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছি বোন। পরে বুঝেছিলাম, দোষ তোমার ছিল না। তাই তোমায় যে কটু বলেছিলাম সেই গ্লানিই এখন আমায় কষ্ট দেয়।

বেলা সস্মিত মুখে বলিল—না দিদি, আপনি আর কিছু মনে রাখ্‌বেন না।

রামজনম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—বেলা, তোমার ভাই যে তাড়া লাগিয়েছেন, ট্যাক্সি আর দাঁড়াতে চায় না।

লীলা উত্তর করিলেন—না চায়, যেতে পারে। আমি অন্য গাড়ী বেলাকে আনিয়ে দেব। এত শীঘ্র ওর যাওয়া হবে না, বলে দাও।

রামজনম একটা খাম লীলার হাতে দিয়া বলিলেন—তোমার চিঠি। এটা সকালেই কাছারিতে পেয়েছি—দিতে ভুলেছিলাম।

লীলা চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

বেলা চরকা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া বলিল—একবার দাদামশায়ের কাছে যেতে হবে।

লীলা বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা লোক ত তুমি! এতবড় একটা সুখবর এতক্ষণ পকেটে চেপে রেখে দিয়েছিলে!

রামজনম জিজ্ঞাসিলেন—কি বল ত?

লীলা বলিলেন—এত সহজে তোমায় বল্‌ছি আর কি! তুমি এখন যাও, বেলার ভাইকে নিয়ে গল্প করগে। গাড়ী ছেড়ে দাও। এখানে চা খেয়ে আমরা দাদামশাইএর কাছে যাব। তাঁকে একটা খবর পাঠিয়ে দাও।

রামজনম ফিরিয়া যাইতেছিলেন, লীলা ডাকিয়া বলিলেন—ওগো, শুনছো? তোমাদের মত কথা চেপে রেখে আমরা হজম করতে পারি নে—শুনেই যাও। বেলার যে বিয়ে—এই শনিবারে।

মাথা নাড়িয়া রামজনম বিজ্ঞের মত কহিলেন—হাঁ, জয়করণের সঙ্গে ত!

লীলা হাসিয়া উত্তর করিলেন—না, ছাপরার এক ডেপুটি, নতুন বোধ হয়। নামটি বড় চমৎকার, বল্ না ভাই বেলা। এখনই বলে নে, এর পরে আর উচ্চারণ করতে নেই, ইষ্টমন্ত্রেরও বাড়া! কি কড়া নিয়ম ভাই ওদের, আমাদের বেলা?

বেলা উত্তর দিবে কি, লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল!

*   *   *   *

অভিজ্ঞতার মূল্য

লাহিড়ী তখন বাহিরের ঘরে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া একটা মোটা কেতাব পড়িতেছিলেন।

পদশব্দে মুখ তুলিয়া চশমার ফাক দিয়া দেখিয়া বলিলেন—এস, এস, সব। আরে, এ যে বেলা! বিয়ের কনে এমন করে ঘুরে বেড়ায়!

সকলে আসন গ্রহণ করিলে লীলা বলিলেন—বেলা যে আপনাকে নেমন্তন্ন কর্ত্তে এসেছে।

ডাক্তার বিষণ্ণমুখে বলিলেন—তার মানে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। সকালে চিঠি পেয়ে অবধি মন একদম খারাপ হয়ে গেছে। বই টই পড়ে কোন রকমে মন ভোলাচ্ছি। নাঃ, বড় আশা হয়েছিল যে জয়করণ যখন বিতাড়িত হয়েছে, তখন এবার আমার ভাগ্যই বুঝি সুপ্রসন্ন!

বেলা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল। লীলা বলিয়া উঠিলেন—এখনও চেষ্টা করে দেখুন না, হাতের কাছে ত পেয়েছেন!

ডাক্তার কহিলেন—ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র পাবার পর? না ভাই, শেষে নারীহরণ মামলায় পড়ে যাব!···বলিয়া রামজনমের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

রামজনম কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন—এদিকে যে জয়করণ বলে বেড়ায়, তার বিয়ের সব ঠিক।

ডাক্তার বলিলেন—তাই ছিল, ধামনে বটে। কিন্তু আজকের খবর সেখানেও ফস্কে গেছে।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—তাই নাকি? আপনি কোথায় শুনলেন?

ডাক্তার বলিলেন—আজ সকালেই যে আমি ধামন গিয়েছিলাম। সে অনেক কথা—থাক্। এখন বেলার বিষয় শোনা যাক্—কি বল?

বেলা সুযোগ পাইয়া বলিতে লাগিল—দাদামশাই, আপনার কাছে এসেছি—যদি আপনার মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি—

দুই হাতে তুলিয়া লাহিড়ী বলিলেন—আর কথায় কাজ কি! গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কি লাভ?

তাহার পর উঠিয়া গিয়া বেলার মাথায় ডান হাতখানি রাখিয়া লাহিড়ী গদগদস্বরে বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করি দিদি, সুখী হও!

পাচক আসিয়া সংবাদ দিল, সব প্রস্তুত।

লাহিড়ী হাসিয়া বলিলেন—আমার অভিজ্ঞতাও কম হ'ল না!

রামজনম কহিলেন—কি রকম শুনি?

ডাক্তার বলিলেন—আগে আহারাদি হয়ে যাক। তার পর নিজের কথা সকলে একে একে বলা যাবে। মোক্তার সাহেবের কাহিনী বোধ হয় সবচেয়ে করুণ!

লীলা বলিলেন—আর আমার?

বেলা বলিয়া উঠিল—আমার কিন্তু বড়ই মর্ম্মান্তিক!

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন—আজ আমাদের মধ্যে একজন নেই, তার কথা যতদূর জানি, আমিই বলবো। ভগবানের কাছে

অভিজ্ঞতার মূল্য

প্রার্থনা, কিশোরী যেন অচিরে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করেন। যার কাহিনী যতই করুণ মর্ম্মন্তুদ হোক না কেন, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই যে বিনামূল্যে শিক্ষালাভ সহজে বড় একটা হয় না এবং যত কিছুই না দুঃখকষ্ট পেয়ে থাকি, জীবনে বৃথা কিছুই যাবে না।

সমাপ্ত

